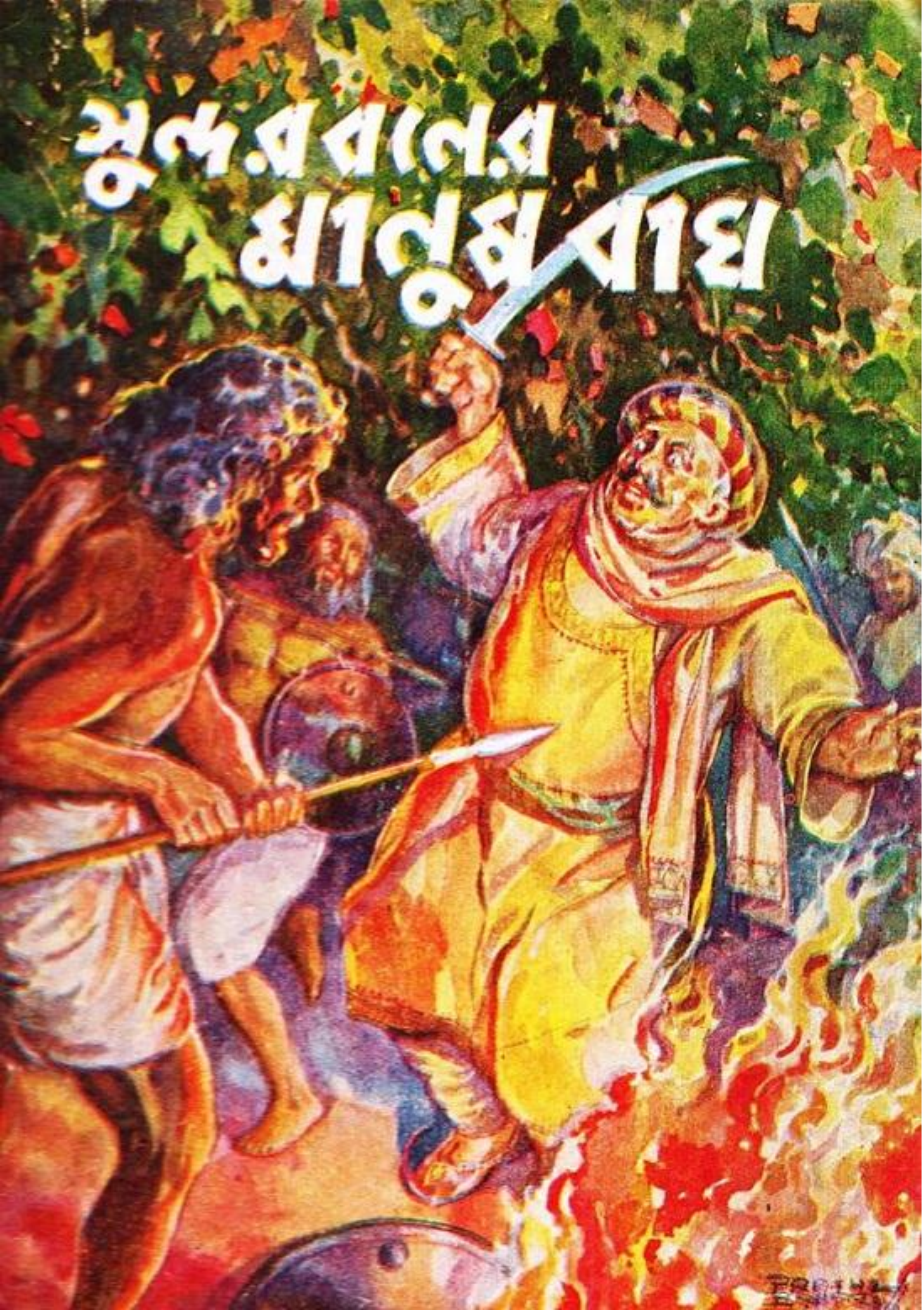
সুন্দরবনের
মানুষ বাঘ

সুন্দরবনের মানুষ-বাঘ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

Find More Books

Books.shishukishor.org

www.dlobl.org

যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে এই প্রজেক্টকে আরো অনেকটা এগিয়ে নেবার জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কোন ডোনেশন চাই না আমরা। আপনার দেওয়া অর্থর জন্য আমরাও কিছু দিতে চাই আপনাদের।

অনুগ্রহ করে www.dlobl.org তে অংশগ্রহণ করুন। অংশগ্রহণ ফি প্রতিমাসে মাত্র ৩০ টাকা। যার বিনিময়ে আপনি প্রতিমাসে পাবেন বড়দের উপযোগী ৪ (চারটি) বই। আপনার দেওয়া এই অর্থ দিয়ে তৈরী হবে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রতিমাসের মাত্র ৩০ টাকাই দিতে পারে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ইন্টারনেট দুনিয়া। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আপনিও আমাদের এই পথচলায় সামিল হোন। সকলে মিলে এগিয়ে চললে, আমাদের পথচলা মসৃণ হবে। আমরা মনে সাহস পাবো।

ধন্যবাদ
শিশির শুভ্র

গোড়াপত্তন

বাংলা দেশে তখনও ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং মোগল রাজশক্তিও হয়ে পড়েছে তখন নিতান্ত দুর্বল। দিল্লিতেও বাদশা আছেন এবং বাংলাতেও নবাব আছেন; কিন্তু তাঁদেরও নাগালের বাইরে তখন ছিলেন এমন সব রাজা-রাজড়া, যাঁদের স্বাধীন ছাড়া আর কিছুই বলা চলত না! নিজের নিজের এলাকায় তাঁরা ছিলেন নিরঙ্কুশ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাদের গল্প আরম্ভ হবে এই সময়েই।

সুন্দরবন আজ বাঘের জন্মস্থান বলেই বিখ্যাত; কিন্তু এমন এক সময় গিয়েছে, যখন সুন্দরবনে নানাদিকেই ছিল বড়ো বড়ো জনবহুল নগর ও গ্রাম। তখনও সেখানে অরণ্য ছিল বটে, কিন্তু সে হচ্ছে, লোকারণ্য। আজও শিকারিরা বন্দুক হাতে করে গভীর জঙ্গলে ঢুকে সেইসব জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। ভগ্ন প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির—তাদের ভিতরে হয়তো আজ আশ্রয় নিয়েছে ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দল! ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অনেক অংশই এইভাবে সুন্দরবনের কবলগত হয়েছে। আসলে সুন্দরবন তখনও ছিল বটে, কিন্তু তার আকার এখনকার মতো এতটা বৃহৎ ছিল না।

এই অঞ্চলে এক সময় একটি মস্ত বড়ো রাজ্য ছিল, তার রাজধানীর নাম—পুষ্পপুর। এখানে সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করতেন মহারাজা ইন্দ্রদমন।

ইন্দ্রদমন ছিলেন সর্বগুণে গুণী মহারাজা, তাঁর শাসনে থেকে প্রজাদের সুখ-সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। প্রজারা পুষ্পপুরের সঙ্গে পুরাণ-বিখ্যাত রামরাজত্বের তুলনা করত সগৌরবে।

একদিন সকালবেলায় উঠে মহারাজা ইন্দ্রদমন তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করলেন।

মন্ত্রী এসে দেখলেন, মহারাজের কপালে চিন্তার রেখা। একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, এমন অসময়ে হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন?'

মহারাজা মৃদু হেসে বললেন, 'কারণ আছে, মন্ত্রীবর! কাল থেকে আমার মন বড়ো ব্যাকুল হয়েছে।'

—'মহারাজ, আপনার মন ব্যাকুল? কেন, বহিঃশত্রু কি আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে?'

মহারাজা বললেন, 'না মন্ত্রীমশাই, ও-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! রাজ্য আমার নিরাপদ, প্রজাদের দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই, কিন্তু ব্যাকুলতা জেগেছে আমার মনের ভিতরেই।'

—'এ ব্যাকুলতা কীসের মহারাজ?'

—'মন্ত্রী, ইহকালে আমার তো কোনও অভাবই নেই, কিন্তু পরকালের জন্যে কিছুই যে সঞ্চয় করতে পারিনি! এই রাজত্ব কাঁধে করে আমি তো বৈতরণীর পরপারে যেতে পারব না! সেইজন্যেই ব্যাকুল হয়েছি।'

—'মহারাজ, আপনি কী করতে চান?'

—'আমি যদি কিছুদিন তীর্থে গিয়ে ধর্মাচরণ করে আসি, তাহলে হয়তো পরকালের একটা উপায় হতে পারে। আপনার মত কী মন্ত্রী?'

মন্ত্রী একটু ভেবে বললেন, 'আপনি হচ্ছেন এ-রাজ্যের মাথা । আপনি না থাকলে রাজকার্যে অনেক বাধা উপস্থিত হতে পারে। আপনাকে আমরা ছাড়তে পারব না।'

মহারাজা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'চিরকালটাই আপনারা আমাকে ইহকালের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলেন? তা হয় না মন্ত্রী! তীর্থপর্যটন করা হিন্দুরাজাদের একটি প্রধান কর্তব্য কাজ; আপনারা আমাকে আর কর্তব্য পালনে বাধা দেবেন না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'কিন্তু মহারাজ, আপনার অবর্তমানে রাজ্যের ভার নেবে কে? যুবরাজ এখনও সাবালক হননি!'

মহারাজ বললেন, 'কেন, রাজ্যচালনা করবেন আমার ছোটোভাই রুদ্রনারায়ণ।'

রুদ্রনারায়ণের নাম শুনেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে পড়ল। কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্য মহারাজাকে বাধা দিতে পারলে না। তিনি যথাসময়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু মন্ত্রীর দুর্ভাবনার কারণও আছে। রাজা না হয়েই রুদ্রনারায়ণ দেশময় এমন সুনাম কিনেছিলেন যে, প্রত্যেক লোকই করত তাঁকে যমের মতো ভয়। লোকের উপরে অত্যাচার করা—কারুর হাত, কারুর পা কেটে নেওয়া—প্রজাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া—এইসব ছিল তাঁর কাছে মজার খেলা! তাঁর নিষ্ঠুরতায় কত প্রজাই যে শহর ও গ্রাম ছেড়ে প্রাণের ভয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে, তার আর সংখ্যা নেই । মহারাজা তাঁর এই অবাধ্য ভাইটিকে ভালোবাসতেন; কারণ, শিশুকাল থেকেই তিনি পুত্রাধিক স্নেহে তাঁকে লালনপালন করে আসছেন। রুদ্রনারায়ণের অত্যাচার-কাহিনি শুনলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন, ক্রুদ্ধও হতেন এবং ভাইকে সৎ উপদেশও দিতেন, কিন্তু কোনও কঠোর শাস্তির কথা তাঁর মনে আসত না। সবদিকে গুণবান মহারাজ ইন্দ্রদমনের দুর্বলতা ছিল এইটুকুই।

মহারাজের তীর্থগমনের পর এই রুদ্রনারায়ণেরই হাতে পড়ল এতবড়ো রাজ্যচালনার ভার এবং দু-দিন যেতে না যেতেই তাঁর কঠিন রাজদণ্ডপরিচালনায় দিকে দিকে উঠল প্রজাদের মর্মভেদী আর্তনাদ!

মন্ত্রীরা সর্বদাই ভয়ে তটস্থ,—একটু এদিকওদিক হলেই রাজভ্রাতার মুখের কথায় কাঁধের উপর থেকে মুণ্ড খোয়া যাবার সম্ভাবনা! দেশের কোনও সাধু লোকই সুপরামর্শ দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন না, রাজভ্রাতার চারিপাশে এসে জুটল যতসব অত্যাচারী দুষ্ট জমিদার। প্রতিদিনই হতে লাগল নতুন নতুন কড়া আইন জারি!

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, রাজভ্রাতার হুকুম হয়েছে, বনের ভিতরে কেউ হরিণ শিকার করতে পারবে না, হরিণ বধ করলেই প্রাণদণ্ড হবে।

রুদ্রনারায়ণের সমস্ত অত্যাচার ও খেয়ালের কথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ছয় মাস যেতে না যেতেই প্রজারা সর্বদাই প্রার্থনা করতে লাগল, ‘হে মা কালী, হে মা দুর্গা, আমাদের দয়াল রাজা ইন্দ্রদমনকে আবার ফিরিয়ে আনো!’

কিন্তু ইন্দ্রদমনের তাড়াতাড়ি ফেরার কোনও সম্ভাবনাই দেখা গেল না। তিনি যে এখন ভারতের কোথায়, কোন তীর্থে পর্যটন করছেন—সে খবরও কেউ জানে না।

নিধিরামের হরিণ-শিকার

পুষ্পপুর শহর থেকে মাইল পঞ্চাশ তফাতে একখানি গ্রাম ছিল। গ্রামের নাম হচ্ছে ময়নাপুর। রবীন্দ্র চৌধুরি ছিলেন সেখানকার জমিদার।

এ অঞ্চলে এইখানিই হচ্ছে শেষ গ্রাম। কারণ, এই গ্রামের পরই খানিকটা চাষজমি ও মাঠ, এবং তারপরই আরম্ভ হয়েছে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল ।

তখন বর্ষা নেমেছে, সবুজ বনের উপরে আকাশ মেলে দিয়েছে তার কাজলকালো মেঘের আঁচল। মাঠের উপরে এবং জঙ্গলের ভিতরে কোথাও থই থই জল, কোথাও দুই ইঞ্চি পুরু আঠার মতন কাদার প্রলেপ। এ বছরের বর্ষা এখানে এসেছে একটা দুর্ভাগ্যের মতন; কারণ, অতিরিক্ত জলঝড়ে খেতের সমস্ত ফসলই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং চাষিদের ঘরে ঘরে উঠেছে হাহাকার!

সেদিন সকালে জঙ্গলের ভিতরে দেখা গেল একজন লোককে। তার পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন এবং হাতে ধনুক-বাণ। ঝোপ-ঝাপের ভিতর দিয়ে চোরের মতন এগুতে এগুতে মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে; সতর্ক চোখে একবার এদিকে-ওদিকে ও পিছনদিকে তাকিয়ে দেখছে, তারপর আবার অগ্রসর হচ্ছে পা টিপে টিপে সামনের দিকে।

জঙ্গল সেখানে ঘন নয়। মাঝে মাঝে গাছপালা ঝোপঝাপ, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো ঘাসজমি।

এই-রকম ছোট্ট একটি সবুজ জমির উপরে দেখা গেল একদল হরিণকে। তাদের দেখেই লোকটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ধনুকে বাণ লাগিয়ে লক্ষ্য স্থির করে বাণ ত্যাগ করলে। একটা হরিণ তখুনি মাটির উপরে পড়ে ছটফট করতে লাগল এবং বাকি হরিণগুলো পালিয়ে গেল।

লোকটি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একখানা বড়ো ছুরি বার করে আহত হরিণটাকে বারকয়েক আঘাত করলে। হরিণটার দেহ থেকে বাকি প্রাণটুকুও বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ হল। লোকটা চমকে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তার মুখ মড়ার মতন সাদা!

তখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি যুবক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ গঠন। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে বড়োঘরের ছেলে।

আগন্তুক গম্ভীর স্বরে বললে, 'তোমার ছোরা নামাও নিধিরাম! তুমি কি আমাকেও মারতে চাও?'

নিধিরামের হাত থেকে ছোরাখানা পড়ে গেল, এবং সে-ও তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ে কাতর স্বরে বলে উঠল, 'হুজুর, হুজুর! আমাকে মাপ করুন, তিন দিন আমি খেতে পাইনি! আজ এই হরিণটাকে না মারলে আমাকে মারা পড়তে হত।'

—'হরিণটা মেরেও আজ তো তোমাকে মারা পড়তে হবে নিধিরাম। তুমি কি জানো না এ রাজ্যে হরিণ শিকারের শাস্তি হচ্ছে শূলদণ্ড?'

নিধিরাম হতাশভাবে বললে, 'জানি কর্তামশাই, জানি! না খেয়ে মরার চেয়ে, খেয়ে মরাই কি ভালো নয়? জমিদারবাবু আমাকে আজ পথের ভিখারি করেছে। আমার আর মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই ।'

যুবক বললে, 'তুমি তো রাঘব রায়ের প্রজা?'

—'আজ্ঞে হাঁ কর্তামশাই, কিছুদিন আগেও আমি তাই ছিলুম! কিন্তু আজ আমি ভগবানের প্রজা—যদিও তিনিও আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে রাজি নন।'

—‘হ্যাঁ নিধিরাম, রাঘব রায় যে বড়ো কঠিন লোক, সেকথা এ অঞ্চলে সবাই জানে। কিন্তু তিনি তোমার কী করেছেন?’

—‘তিনি? কর্তামশাই, তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন! এবারের বর্ষায় আমার খেতে ফসল হয়নি, তাই খাজনা দিতে পারিনি। সেই দোষে জমিদারবাবু আমার ঘরবাড়ি দখল করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাকে গাছতলায় এসে বসতে হয়েছিল। কিন্তু কর্তামশাই, গাছতলায় বসে মানুষ কি আর বাঁচতে পারে? বউ আর মেয়েটা গেলহপ্তায় ওলাউঠায় মারা পড়েছে, এখন ছেলেটাকে নিয়ে বেঁচে আছি খালি আমি। কিন্তু আজ তিন দিন আমাদেরও পেটে অন্ন পড়েনি, আজ সকালে ছেলেটা খিদের জ্বালায় ছটফট করে কাঁদছিল; তাই আর আমি সইতে না পেরে, বনের ভিতরে এসে মেরেছি এই হরিণটাকে। এর জন্যে যদি মরতেও হয়, তাহলে অন্তত আমি ছেলেকে খাইয়ে আর নিজেও খেয়েদেয়ে ভরাপেটে মরতে পারব ।’

যুবকের দুই চোখে জাগল দয়ার আভাস। সে জিজ্ঞাসা করলে, ‘তোমার ছেলে কোথায় নিধিরাম?’

নিধিরাম আঙুল তুলে বনের বাইরের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ‘ওইখানে একটা গাছতলায় কাঁথামুড়ি দিয়ে তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি ।’

যুবক অল্পক্ষণ নীরবে কী ভাবলে। তারপর বললে, ‘আচ্ছা নিধিরাম, তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে চলো। তারপর দেখা যাবে, তোমার কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না!’

নিধিরাম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না; খানিকক্ষণ সে হাঁ করে যুবকের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, ‘কর্তামশাই, আমি যাব আপনার বাড়িতে! আমি যে রাজার হরিণ মেরেছি!’

যুবক হাসতে হাসতে বললে, 'নিধিরাম, হরিণের পাল যখন আমার প্রজাদের খেতে এসে অত্যাচার করে, তখন আমাকেও মাঝে মাঝে দু-চারটে মারতে হয় বই কি! এসো নিধিরাম, ছেলেকে নিয়ে সঙ্গে এসো; অন্তত আমার গোয়ালঘরের কোণেও তোমাদের জন্যে একটুখানি জায়গা হতে পারে।'

নিধিরাম যুবকের সঙ্গে অগ্রসর হল। এই যুবকের নাম, রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি, ইনিই ময়নাপুরের তালুকদার।

তিন বছর আগে, রবীন্দ্রনারায়ণের পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন রঘুনাথপুরের জমিদার রাঘব রায় এই তালুক থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারেনি। তবু আজ ময়নাপুর-তালুকের উপরে তার শনির দৃষ্টি হয়ে আছে সর্বদাই জাগ্রত।

দুপুরবেলায় বনের চারিদিকে তদারক করতে করতে পাইক হরুসর্দার এক জায়গায় এসে সবিস্ময়ে দেখলে, মাটির উপর লেগে রয়েছে অনেকখানি রক্তের দাগ।

হরুসর্দার নিজের মনে-মনেই বললে, 'হুঁ, দেখছি এখানে হরিণ-টরিণ মারা হয়েছে।...কিন্তু মারলে কে? আর ব্যাটা গেলেই বা কোন দিকে?'

তাকে বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। এদিকে ওদিকে দু-একবার চোখ বুলিয়ে সে দেখতে পেলে, কাদার উপরে দু-জোড়া পায়ের ছাপ! পরীক্ষা করে বুঝলে, এখানে যে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজনের পায়ে জুতো আছে, আর একজনের খালি পা।

সেই দু-জোড়া পায়ের ছাপ কাদার উপর দিয়ে বরাবর বনের বাইরে চলে গেছে, হরু সর্দার তার অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগল। তারপর সেই চিহ্ন ধরে সে একেবারে হাজির হল গিয়ে ময়নাপুর গ্রামের

চৌধুরিবাড়ির ফটকের কাছে। এবং সেইখান থেকেই সে দেখতে পেলে, চৌধুরিবাড়ির বাইরেকার উঠানে বসে নিধিরাম এক মনে একটা মৃত হরিণের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

হরু আর সেখানে দাঁড়াল না, সিধে চলল একেবারে রঘুনাথপুরে, রাঘব রায়ের কাছে। ময়নাপুর থেকে রঘুনাথপুর বেশি দূর নয়। আর, ময়নাপুরের মতন রঘুনাথপুরের গ্রামখানিও আকারে ছাোটোখাটো নয়; তাকে একখানি মস্ত গ্রাম বা ছোটো নগর বলা চলে। চারিদিকে অনেক লোক আসা যাওয়া করছে, প্রকাণ্ড জমিদারবাড়ি—দেখতে প্রায় কেল্লার মতনই, ফটকে বসে আছে, নাদাপেট, ইয়া গালপাট্টাওয়ালা দারোয়ানের দল!

ফটকের ভিতর দিয়ে ঢুকে হরুসর্দার একেবারে সেইখানে হাজির হল, যেখানে বৈঠকখানায় বসে রাঘব রায় জমিদারি কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করছে। এই রাঘব রায় হচ্ছে এ অঞ্চলের একজন জবরদস্ত মস্ত জমিদার। তার উপরে সে হচ্ছে, রাজভ্রাতা রুদ্রনারায়ণের একজন বিশেষ বন্ধু এবং এইজন্যে সকলে-বিশেষ করে গরিবরা তাকে ভয় করত মূর্তিমান যমের মতো! ভয় করবার কারণও ছিল যথেষ্ট, এখানকার লোকজনের উপরে সে এত নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে যে, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না ।

হরুসর্দার ঘরে ঢুকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে, ‘হুজুর, রাজার হরিণ সাবাড়!’

রাঘব রায়ের মুখ থেকে আলবোলার নল খসে পড়ল। চমকে, চোখ পাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, ‘হরিণ সাবাড় মানে কী রে? কে সাবাড় করলে?’

হরুসর্দার বললে, ‘হুজুর, ময়নাপুরের রবিন চৌধুরি! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, রবিন চৌধুরির উঠোনে বসে সেই ব্যাটা নিধিরাম হরিণের ছাল ছাড়াচ্ছে।’

রাঘব গর্জন করে বলে উঠল, ‘হুঁ, রবিন চৌধুরি, বটে? এতদিন পরে হতভাগাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! খুদে তালুকদার রবিন চৌধুরি, আর পথের ভিখিরি নিধিরাম-এখুনি আমি মোহান্ত রামগিরির কাছে চললুম! দেখি, রবিন চৌধুরির চোখ দুটো উপড়ে আর তার হাত দুটো কেটে নিতে পারা যায় কি না।’ সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

হরুসর্দার আবার একবার নমস্কার করে জোড়হাতে বললে, ‘হুজুর, আপনাকে এতবড়ো একটা খবর এনে দিলুম, আমাকে পুরস্কার দেবার হুকুম হোক!’

রাঘব বললে, ‘পুরস্কার? হাঁ, পুরস্কার তুমি পাবে বইকি! আগে মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে রবিন চৌধুরির মুণ্ডপাত করে আসি, তারপর হবে তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা।’ এই বলেই সে ফিরে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে, ‘ওরে, কে আছিস রে, শিগগির একদল পাইক আর তিরন্দাজ নিয়ে আমার সঙ্গে চল! হরু, তুইও আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়!’

রবিনের সুন্দরবনে যাত্রা

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করে রবিন একবার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

বাড়ির সামনে একটা বড়ো মাঠ। বৈকালের সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং মাঠের উপরে বড়ো বড়ো গাছের ছায়াগুলো হয়ে পড়ছে ক্রমেই দীর্ঘতর।

দূরে মাঠে হঠাৎ একটি দৃশ্য রবিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মাঠের উপর দিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র লোক এবং তাদের আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে রঘুনাথপুরের রাঘব রায়।

দুপুরে পাইক হরুসর্দার যে তার বাড়ির উঠানের ভিতরে উঁকি মেরে গিয়েছিল, এ খবরটা তিনি পেয়েছিলেন যথাসময়েই। তারপর এখন তাঁর চিরশত্রু রাঘব রায়কে সদলবলে এদিকে আসতে দেখে আসল ব্যাপারটা তিনি খুব সহজেই বুঝে ফেললেন। কিন্তু রবিন চৌধুরি ভয় পাবার ছেলে নন। গলা তুলে হাঁক দিলেন, ‘সুন্দরলাল!’

সুন্দরলাল হচ্ছে তাঁর পাইকদের সর্দার। সে এসে সেলাম ঠুকে বললে, ‘কী হুকুম, কর্তামশাই?’

রবিন বললেন, ‘সুন্দরলাল, শিগগির জনকয় লোক নিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াও । সঙ্গে হাতিয়ার নিতে ভুলো না। রঘুনাথপুরের রাঘব রায় আসছে আমার বাড়িতে হানা দিতে।’

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে আর এক ছোকরা বেরিয়ে এসে বললে, ‘কর্তামশাই, আমিও তির-ধনুক ছুড়তে পারি, আমিও সুন্দরদাদার সঙ্গে যাব।’

রবিন একটু ঘাড় নেড়ে হেসে সায় দিলেন।

ছোকরা আহলাদে আটখানা হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সে হচ্ছে সামু, রবিনের প্রজা বিষ্ণুলালের ব্যাটা। দুপুরবেলায় বাপকে ফাঁকি দিয়ে সুন্দরলালের কাছে এসেছিল আডা মারতে।

এমন সময়ে নিধিরাম কোথা থেকে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কর্তামশাই, কর্তামশাই! আমার জন্যে কেন আপনি বিপদে পড়বেন? তার চেয়ে ওদের কাছে গিয়ে আমিই নিজের দোষ স্বীকার করে আসি। আমাদের কপালে যা আছে, তাই হবে।'

রবিন বললেন, 'চুপ করো নিধিরাম, বাজে বকবক কোরো না! রবিন চৌধুরি যাকে আশ্রয় দেয়, তাকে কখনও ত্যাগ করে না। তার জন্য সে সব বিপদ সইতে প্রস্তুত! যাও, তুমি লুকিয়ে থাকো গে! আজ আমি রাঘব রায়ের বিষদাঁত ভাঙব, তবে ছাড়ব!'

খানিক পরে দলবল নিয়ে রাঘব রায় যখন চৌধুরিবাড়ির কাছে এসে পড়ল, তখন সে একটু বিস্মিতভাবেই দেখলে, তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমেই রবিন চৌধুরি, তারপর সুন্দরলাল ও রামু, তারপরে ছয়জন পাইক! রবিনের হাতে ধনুক, কোমরে তরবারি, রামু ও সুন্দরলালেরও সেই হাতিয়ার এবং পাইক ছ-জনের হাতে বড়ো বড়ো লাঠি ও কাঁধে ঝোলানো ধনুক ।

তির-ধনুকে রবিনের দক্ষতা ছিল এ অঞ্চলে বিখ্যাত। লাঠি খেলাতেও তাঁর জুড়ি পাওয়া যেত না; এবং তাঁর কাছ থেকে রীতিমতো শিক্ষালাভ করে এইসব পাইকও হয়ে উঠেছিল লাঠিখেলায় ও অস্ত্রচালনায় যথেষ্ট নিপুণ!

রাঘব রায় ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রবিন তাঁর ধনুকে তির যোজনা করলেন। সুন্দরলাল ও রামুও করলে তাদের প্রভুর দৃষ্টান্তের অনুকরণ।

ঘোড়ার উপর থেকে রাঘব গম্ভীরস্বরে বললে, 'ওহে ময়নাপুরের রবিন চৌধুরি! এখুনি অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো! মোহান্ত মহারাজ রামগিরির কাছে আমাদের সঙ্গে তোমাদের যেতে হবে!'

ধনুকে তির লাগিয়ে রবিন ছিলা টেনে ধরলেন—যেন এখনই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন। তাই দেখে রাঘবের পাইকরা পিঠ থেকে বাঁধন আলগা করে ঢালগুলো হাতে নিলে।

রবিন হাসতে হাসতে বললেন, 'রায়মশাই, আপনি যে এসেই বড়ো শক্ত শক্ত কথা শুরু করেছেন! ব্যাপার কী? কী আমি করেছি? আত্মসমর্পণ করব কেন?'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রাঘব বললে, 'কী তুমি করেছ? তোমরা রাজার হরিণ মেরেছ! এর শাস্তি কী জানো তো? তোমার তালুক হবে বাজেয়াপ্ত আর তোমার ডান হাত যাবে কাটা।'

রবিন বললেন, 'এখনও বিচার হল না, তার আগেই শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল?'

ঘৃণাভরে রাঘব বললে, 'ওরে গাধা! তোর আবার বিচার কী রে? তুই নিজেকে একটা কেউকেটা বলে মনে করিস নাকি? না, না, বিচার টিচার তোর হবে না--'

রবিনও খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ওরে বদমাইস চোর! জানি, বিচার আমার হবে না! মহারাজ ইন্দ্রদমন তীর্থে যাবার পর থেকেই এ রাজ্য হয়েছে অরাজক! কিন্তু আমার তালুকে, বাইরের লোকের গোলমাল আমি সহ্য করব না! আর এক পা কেউ যদি এগিয়ে আসে, তাহলে কাল আর সূর্যের মুখ দেখতে পাবে না!'

রাঘব তার ঘোড়ার উপরে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর নিজের একজন পাইককে সে কাছে আসবার জন্যে ইঙ্গিত করলে। পাইক ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ালে পর, রাঘব চুপি চুপি তার কানে কানে বললে, ‘ঢালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রবিন চৌধুরিকে টিপ করে একটা বাণ ছা◌েড়ো।’

পাইক পিছিয়ে গিয়ে তখনই করলে প্রভুর হুকুম তামিল। একটা তির সশব্দে বাতাস কেটে শূন্যে ছুটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিরবিদ্ধ মস্তকে রবিনের একজন পাইক লুটিয়ে পড়ল মাটির উপরে।

রবিন গর্জন করে বললেন, ‘তাহলে তোরাই করলি প্রথম রক্তপাত! ওরে রাঘব রায়, হুঁশিয়ার! নইলে আমার তালুকে ঢুকবে তোর মৃতদেহ।’ বলেই তিনি তাঁর ধনুক তুলে তির ত্যাগ করলেন।

তির এমন বেগে গিয়ে রাঘবের বর্মের উপরে আঘাত করলে যে, সে তখনই ঘোড়া থেকে পড়ে

যেতে যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিলে। বর্ম না থাকলে সেদিন তাকে আর বাঁচতে হত না! তারপরেই চোখের পলক পড়তে না পড়তেই রবিনের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত আর একটা তির সেই লোকটার উপরে গিয়ে পড়ল, সর্বপ্রথমে যে করেছিল অস্ত্রত্যাগ! সে-ও তখনই হল ‘পপাত ধরণীতলে’! দেখতে দেখতে তার রক্তে সেখানকার মাটি রাঙা হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যেই রবিনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরলাল ও রামুও আরও কতকগুলো তির ছুড়েছে। এবং তার ফলে রাঘবের দলের আরও একজন লোক মারা পড়ল ও আর একজনের পায়ের ডিম হয়ে গেল এফোঁড় ওফোঁড়!

রবিন বললেন, ‘তিনটে আপদ গেল!’ বলেই তিনি দেখতে পেলেন, শত্রুপক্ষের একজন তিরন্দাজ ধনুক তুলে তাঁর দিকে লক্ষ্য স্থির করছে। পরমুহূর্তেই রবিনের ধনুকের ছিলা বেজে উঠল এবং একটা বাণ ছুটে গিয়ে লোকটার কবজি করে দিলে ছ্যাঁদা!

রবিন চিৎকার করে বললেন, ‘চারটে আপদ গেল! ওহে রাঘব রায়, আমার অভ্যর্থনা কেমন লাগছে তোমার?’ বলেই আবার টানলেন ধনুকের ছিলা এবং আবার আর-একটা বাণ গিয়ে আঘাত করলে রাঘবের বর্মকে! এবারে আর টাল সামলাতে না পেরে মাটির উপরে ঠিকরে পড়ে রাঘব গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ঠিক এই সময়েই কোথা থেকে পাগলের মতন ছুটে এল নিধিরাম- জ্বলন্ত তার দুই চক্ষু, জ্বলন্ত তার হাতের ছোরা!

সকলকে এড়িয়ে একলাফে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হরুসর্দারের ঘাড়ের উপরে এবং এক ধাক্কায় তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, তার দেহের উপরে ছোরার আঘাত করতে করতে বললে, ‘ওরে গুপ্তচর! তোর জন্যেই আজ আমি সর্বহারা! তুই আমার বউকে মেরেছিস, এই নে,—খা এক ঘা; এই নে,—খা আরও এক-ঘা! তুই আমার মেয়েকে মেরেছিস, এই নে,—খা আরও-এক ঘা!’—আঘাত সইতে সইতে মরণোন্মুখ হরুসর্দারও ছোরা তুলে নিধিরামের বুকের উপরে বসিয়ে দিলে! হরু সর্দারের মৃতদেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল নিধিরামের মৃতদেহ!

সকলের দৃষ্টি যখন নিধিরাম ও হরু সর্দারের দিকে আকৃষ্ট, সেই অবসরে রাঘব রায় তার এক অনুচরের সাহায্যে মাটি থেকে আবার উঠে পড়ল। এবং রাগে আগুন হয়ে চিৎকার করে বললে, ‘আক্রমণ কর! আক্রমণ কর!’

কিন্তু আক্রমণ করবে কী, রাঘবের সাঙ্গপাঙ্গরা রবিনের দলের তির এড়াবার জন্যেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল ।

রাঘব জানে তার দেহে আছে কঠিন বর্ম, কোনও তিরই তা সহজে ভেদ করতে পারবে না। সুতরাং সাহসে ভর করে সে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এল।

রবিনও তখন ধনুকের বদলে তরবারি নিয়ে রাঘবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং দু-জনের মধ্যে আরম্ভ হল বিষম এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ!

দু-পক্ষের লোকই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগল।

কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়েই রাঘব তখনও কাবু হয়ে আছে, তার উপরে দেহে তার রীতিমতো ভারী বর্ম; কাজেই রবিনের ক্ষিপ্রগতিকে সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারলে না-বর্মের উপর তরবারির চোট খেয়ে আবার হল পপাত ধরণীতলে!

কঠিন বর্ম লেগে রবিনের তরবারি ভেঙে দু-খান হয়ে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি শত্রুর আলগা মুঠোর ভিতর থেকে তরবারিখানা টেনে নিয়ে বললেন, 'ওহে রাঘব রায়, বর্মের দৌলতে এযাত্রা তুমি বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু এখন আত্মসমর্পণ করবে কি না বলো!'

দাঁতে দাঁত চেপে রাঘব বললে, 'কখনও না!'

রবিন ফিরে বললেন, 'সুন্দরলাল, তুমি এসে রাঘবকে ধরো। দড়ি দিয়ে ওকে খুব কষে বেঁধে ফ্যালো! এইবারে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।'

সুন্দরলাল প্রভুর হুকুম তামিল করলে। রাঘব বিফল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে অশ্রান্তভাবে গালাগলি বৃষ্টি করতে লাগল।

রবিন বললেন, 'চুপ করো রাঘব, চুপ করো! তোমার মন আর মুখ দুইই সমান খারাপ। জানো, এখন তোমার মাথার ওপরে খাঁড়া ঝুলছে?'

রাঘব বললে, 'হাঁ, হাঁ, এ অপমানের চেয়ে মৃত্যুও ভালো! মারো আমাকে!'

—'না রাঘব, আজ এরই মধ্যে মারা পড়েছে অনেকে, আর রক্তপাত নয়! শোনো রাঘব, আজ যে-ব্যাপারটা হল, তার ফলে আমাকে যে লোকালয় ছাড়তে হবে, একথা আমি জানি। তোমাদের প্রভু মোহান্ত রামগিরি আমাকে আর কখনই ক্ষমা করবে না। সে যখন এঅঞ্চলের সর্বেসর্বা, তখন তার কাছে আমি একজন দূত পাঠাতে চাই!...সুন্দরলাল, রাঘবকে ধরাধরি করে আবার ঘোড়ার ওপরে তুলে দাও তো!.. হ্যাঁ, রাঘবের মুখ ফিরিয়ে দাও ঘোড়ার ল্যাজের দিকে!'

রাঘব বাধা দেবার জন্যে প্রাণপণে হাত-পা ছুড়তে লাগল, কিন্তু তার কোনও জারিজুরিই খাটল না। সুন্দরলাল তাকে টেনে তুললে ঘোড়ার উপরে এবং রাম তার পা দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে ঘোড়ার পেটের তলায়!

রবিন বললেন, 'ভালো করে শুনে রাখো রাঘব! আজি তুমিই হলে আমার দূত! মোহান্ত রামগিরিকে বলবে, তিনি আর তাঁর সাঙ্গাপাঙ্গ যত ডাকতের দলকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! আজ আমি তোমাদের হাতে ময়নাপুরকে ছেড়ে চললুম বটে, কিন্তু আজ থেকে আমি হলুম তোমাদের চিরশত্রু! তোমাদের মতো যত ডাকাত আছে এঅঞ্চলে, আজ থেকে আমি তাদের সকলের বিরুদ্ধে করব যুদ্ধ ঘোষণা! হ্যাঁ, আর এক কথা! ময়নাপুর জমিদারি হাতিয়ে ভেবো না খুব দাঁও মারলুম! কারণ, ও জমিদারির দাম আমি শিগগিরই তোমাদের ঘাড় ধরে আদায় করে নেব।—যাও!' বলেই তিনি নিজের তরবারির উল্টো পিঠ দিয়ে রাঘবের ঘোড়ার দেহে আঘাত করলেন এবং পরমুহূর্তেই ঘোড়াটা তিরবেগে ছুটে চলল।

রবিন ফিরে নিজের দলের লোকদের ডেকে বললেন, ‘ভাইসব, ওই রাঘব আর রামগিরি যখন রাজার সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসবে, তখন আমাদের অবস্থা কী হবে জানো?’

সুন্দরলাল বুক ফুলিয়ে বললে, ‘প্রভু, যা হবার তা হবেই, কিন্তু আমরা সবাই শেষপর্যন্ত থাকব আপনার পাশেই।’

-‘হুঁ, আমার পাশে থাকবে বটে, কিন্তু কোথায়? কারাগারে? না, আমার সঙ্গে তোমরাও যাত্রা করবে সুন্দরবনে? সুন্দর সেই সুন্দরবন! সেখানে বাতাস বেড়ায় ফুলের গন্ধ বিলিয়ে আর মাথার উপরে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশ! সেখানকার পথ ঘাট সব আছে আমার নখদর্পণে! শুয়ে থাকব নরম ঘাসের বিছানায়, ভোর হলে জেগে উঠব পাখিদের গানে, খিদে পেলে করব আমরা হরিণ শিকার! আর যখনই সুবিধা পাব, বন থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করব অত্যাচারী দস্যুদলকে! স্বাধীন জীবন, উদ্দাম আনন্দ! কে আমার সঙ্গে যাবে?’

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, ‘আমরা সবাই যাব-সবাই যাব!’

রবিন বললেন, ‘ভাই সব, বহুৎ আচ্ছা! এখন তাড়াতাড়ি দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও! আর রামু, বেচারা নিধিরামের ছেলেকে তোমার বাপের জিম্মেয় রেখে এসো!’

সেইদিন দুপুর-রাত্রের মধ্যেই ময়নাপুরের জমিদারবাড়ি একেবারে খালি হয়ে গেল।

রবিনের নতুন নাম

যেখানে সুন্দরবন মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না, যেখানে গাছের মাথায় মাথায় উড়ে বেড়ায় গানগাওয়া পাখির ঝাঁক, আর তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায় বনের হরিণরা, যেখানে চারিধারে আছে অরণ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর তাদের পদতল ধুয়ে বয়ে যায় কলধ্বনি তুলে ছোটো-বড়ো নদীরা, সেইখানে গিয়ে দলবল নিয়ে বাসা বাঁধলেন ময়নাপুরের পলাতক জমিদার রবিন চৌধুরি।

রবিনের এই নতুন আড্ডার খোঁজ রাখে না কেউ। কোন পথ দিয়ে কেমন করে এখানে আসতে হয়, তাও কেউ জানে না। স্বচ্ছ নদী সকলের তেষ্টা মেটায়, জলখাবার দরকার হলে আছে নানান গাছের ফল, আর উদর পূর্তির জন্যে নধর হরিণের বা নানা পাখির নরম মাংস। ভারী আমোদেই কয়েকটা দিন কেটে গেল!

একদিন রবিন বললেন, ‘ভাইসব, আমরা সবাই সমান। আমাদের মধ্যে কেউ মনিবও নেই। কেউ চাকরও নেই। দুনিয়ায় আমরা কারুর তা়োয়াক্কা রাখব না। আমরা হচ্ছি সুন্দরবনের মানুষ-বাঘ, এইবার আমাদের বিক্রম দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু মনে রেখো, আমরা চতুষ্পদ পশু-বাঘ নই, আমরা মানুষ-বাঘ,—মনুষ্য-ধর্ম ভুলব না। আমরা নিরীহ গৃহস্থ, গরিব চাষাভুষো আর ধার্মিক দয়ালু ধনীর ওপরে কোনও অত্যাচারই করব না—আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে দুষ্টের দমন।’

দলের সবাই একবাক্যে বলে উঠল, ‘হ্যাঁ সর্দার, হ্যাঁ সর্দার!’

রবিন বললেন, ‘বেশ! আপাতত শিকারে বেরুনো যাক!’

সেদিন শিকার করতে করতে তারা বনের প্রান্তে এসে পড়ল। সেখান দিয়ে একটা বড়ো রাস্তা গেছে রাজধানী পুষ্পপুরের দিকে।

রবিনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখলে, সারিসারি ছয়খানা গোরুর গাড়ি ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং প্রথম গাড়িখানার ভিতরটা জুড়ে বসে আছে একটা গেরুয়াপরা, পেটমোটা, ন্যাড়ামাথা মূর্তি। গাড়িগুলোর আগে পিছনে যাচ্ছে কয়েকজন পাইক।

রবিন দলবল নিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়াতে দেরি করলেন না।

গেরুয়া পরা মূর্তিটা ভিতর থেকে ফোলা ফোলা গোল মুখখানা বার করে ক্যাঁককেকে গলায় বললে, 'তোরা কে রে?'

রবিন হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'আমরা হচ্ছি, সোঁদরবনের মানুষ-বাঘ! তুমি কে ঠাকুর?'

—'সে খোঁজে তোর দরকার কী?—ওরে, কে আছিস রে, আপদগুলোকে গলাধাক্কা মেরে বিদেয় করে দে তো!'

কিন্তু কে বিদায় করে দেবো? ইতিমধ্যেই রবিন ও তাঁর সাঙ্গাপাঙ্গদের ভাবভঙ্গি ও সাজপোশাক দেখেই বুদ্ধিমান পাইকরা গতিক সুবিধে নয় বুঝে চটপট কোথায় সরে পড়েছে!

রবিন বললেন, 'ঠাকুর, ভালো চাও তা ে পরিচয় দাও।'

গেরুয়াধারী মুষড়ে পড়ে বললে, 'আমি চন্দ্রনগরের মঠাধ্যক্ষ।'

—'যাচ্ছ কোথায়?'

—'পুষ্পপুরের মোহান্ত মহারাজা রামগিরির কাছে।'

—'গাড়িগুলোর ভেতরে কী আছে?'

—'এমন কিছু নেই বাপু, যত আজেবাজে জিনিস?

—'মিথ্যে কথা! আমি জানি, বছরের এই সময়ে নানান মঠ থেকে রামগিরির কাছে নজর পাঠানো হয়।...সুন্দরলাল, গাড়ির মালগুলো নামিয়ে নাও তো!'

মঠাধ্যক্ষ খাপ্পা হয়ে বললে, ‘দেবতার জিনিসে হাত দিয়ে না, সর্বনাশ হবে-নিপাত যাবে!’

—‘দেবতার জিনিস? ওরে মিথ্যুক সন্ন্যাসী, রামগিরির ভুঁড়ি ভরিয়ে তোরা দেবতাকে খুশি করতে চাস? দেবতা কি এতই বোকা?’

সুন্দরলাল ও অন্যান্য সকলে মিলে গোরুরগাড়ির ভিতর থেকে একে একে বার করে ফেললে চার ঘড়া বাদশাহি মোহর, অনেক রুপোর বাসন ও ঝুড়ি ঝুড়ি মণ্ডা, মিঠাই আর মেওয়া প্রভৃতি!

মঠাধ্যক্ষ বললে, ‘মহারাজা রামগিরির সম্পত্তিতে হাত দাও, কে তুমি পাষণ্ড?’

রবিন আবার হো হো করে হেসে উঠে বললেন, ‘আমি পাষণ্ড নই ঠাকুর, আমি হচ্ছি, পাষণ্ডেরই যম! দেবতার নামে তোমরা যে গরিবদের অন্নজল কেড়ে নাও, আমি হচ্ছি তাদেরই বন্ধু! আমার নাম, রবিন চৌধুরি!’

—‘ও, ময়নাপুরের রবিন চৌধুরি? জানো, রাজা হুকুম জারি করেছেন—যে তোমাকে ধরতে পারবে, তাকে পঞ্চাশ মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।’

—‘দুঃখের বিষয় ঠাকুর, সে পুরস্কার তোমার কপালে নেই!

‘সুন্দরলাল, ঠাকুর আর সঙ্গের লোকজনকে গাড়ির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল তো! এইভাবেই ওরা পুষ্পপুরে যাত্রা করুক।’

সুন্দরলাল তখনই আদেশ পালনে নিযুক্ত হল। মঠাধ্যক্ষ অনেক প্রতিবাদ করলে, অনেক অভিশাপ দিলে, অনেক হাত পা ছুড়লে এবং টিকিও নাড়লে বারংবার, কিন্তু কোনওই ফল হল না!

সেইদিন থেকে রবিনের নাম হল, রবিডাকাত!

খুদে জনার্দনের বাঁশের লাঠি

ময়নাপুরের জন্যে রবিনের একদিন মন কেমন করতে লাগল! তিনি আর থাকতে পারলেন না, ছদ্মবেশ পরে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু ময়নাপুরে গিয়ে দেশের হালচাল দেখে তাঁর চোখে এল জল! এরই মধ্যে খেতে খেতে চাষ বন্ধ হয়েছে, চাষীরা ঘরদোর ছেড়ে পালিয়েছে, গ্রাম প্রায় খাঁ খাঁ করছে, বহু প্রজা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে অন্য জমিদারের আশ্রয় নিয়েছে, অনেকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে রবিন বললেন, 'ভগবান, তুমি যদি থাকো, আমাকে এর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিয়াে! রাঘব রায় আর রামগিরি, এদের উচিতমতো শাস্তি না দিয়ে আমাকে যেন মরতে না হয়।'

ভারাক্রান্ত প্রাণে রবিন আবার বনের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

ফেরবার পথে পড়ে একটা ছোটো নদী। বিজনে গহনবনের কানে কানে যেন গানের তালে গল্প বলতে বলতে নদীটি এঁকেবেঁকে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে!

এক জায়গায় মস্তবড়ো একটা আস্ত গাছ কেটে নদীর বুকের উপরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বনবাসীরা তারই উপর দিয়ে এপার ওপর করে! সেই বন্য সাঁকোর উপর দিয়ে একসঙ্গে দু-জন লোক আনাগোনা করতে পারে না।

রবিন সাঁকোর একমুখে এসে দেখলেন, নদীর ওপর থেকে আসছে আর একজন বিষম ডাগর মানুষ। মাথায় সে পাঁচ হাতেরও বেশি লম্বা এবং চওড়াতেও বড়ো কম নয়! পরনে মালকোঁচামারা কাপড়, হাতে ইয়া মোটা তেলপাকা বাঁশের লাঠি!

সাঁকোর ওমুখে পা দিয়েই দানবের মতন সেই লোকটা বাজখাঁই গলায় বললে, 'হট যাও, হট যাও আমাকে আগে পার হতে দাও!'

রবিনও কম একগুঁয়ে নন! মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু! তা হয় না হে ভুঁদোরাম! আগে পার হব আমি।'

দানব বললে, 'গরিবের বাচ্ছা, ধাক্কা খেয়ে জলে পড়ে কেন দুঃখু পাবি?'

রবিন হেসে বললেন, 'আমি না সাঙাত, আমার সঙ্গে লাগলে জলে ডুবে নাকানি চোবানি খেতে হবে তোমাকেই!'

সাঁকোর মাঝখানে এগিয়ে এসে, হাতের লাঠির ডগাটা রবিনের নাকের কাছে নাড়তে নাড়তে দানব বললে, 'সরে পড়, সরে পড়! নইলে তোর মুখে আর নাকের চিহ্নই থাকবে না!'

রবিন দুই পা পিছিয়েই নিজের ধনুকে বাণ যোজনা করলেন।

দানব বললে, 'ধনুকের ছিলে টেনেছ কী লাঠির বাড়ি দিয়ে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে ধুলো করেছি।'

রবিন বললেন, 'ওরে হাঁদারাম, তুই লাঠি তোলবার আগেই যে আমার বাণ গিয়ে তোর বুক ছ্যাঁদা করে দেবে!'

লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দানব বললে, 'তুই হচ্ছিস মহা কাপুরুষ, আমার হাতে ধনুক থাকলে তোকে শিখিয়ে দিতুম কী করে বাণ ছুড়তে হয়!'

রবিন বললেন, 'আমার হাতে তোর মতন লাঠি থাকলে, আমিও তোকে লাঠিখেলা শেখাতে পারতুম!'

দানব হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, 'তাই নাকি, তাই নাকি? বেশ, তাহলে বাঁশঝাড় থেকে এখুনি একটা বাঁশ কেটে নিয়ে আয় না!'

রবিন বললেন, 'তোমার মতন লড়ায়ে লোক আমি ভারী পছন্দ করি! দাঁড়াও, এখুনি বাঁশ কেটে আনছি।'

একটু পরেই বংশধারী রবিন আবার সাঁকোর উপরে এসে দাঁড়ালেন। সেইখানেই যষ্টিযুদ্ধ শুরু হল ।

দানবের বুঝতে বেশিক্ষণ লাগল না যে, রবিন হচ্ছেন পাকা খেলোয়াড়; কারণ, দুম করে লাঠির এক ঘা এসে পড়ল তার কাঁধের উপরে! চটেমটে সে ষাঁড়ের মতন গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল! এবং সরু সাঁকোর উপরে এতবেশি পাঁয়তারা কষতে লাগল যে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি সে ঝপাং করে নদীর জলে ঝাঁপ খায়!

দানব হাঁকলে, 'শাবাশ! কিন্তু এই তো সবে শুরু! হুঁশিয়ার! মাথা সামলাও!'

রবিনের মাথা ঘেঁষে বোঁ করে দানবের লাঠি চলে গেল! তিনিও মারলেন লাঠি, কিন্তু দানব নিজের লাঠি আড় করে ধরে তাঁর আঘাত ঠেকিয়ে দিলে। পরমুহূর্তেই দানব প্রচণ্ড লাঠি চালিয়ে তাঁর পা ভেঙে দিয়েছিল আর কী! কিন্তু রবিন লাফ মেরে সে আঘাত এড়িয়ে গেলেন। দু-জনেরই তখন হাঁপ ধরেছে।

রবিন বললেন, 'ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে—এইবারে শান্তি।'

দানব হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমারও তাই ইচ্ছে! এইবারে হাত-পা ছড়িয়ে ভালো করে হাঁপ ছাড়া দরকার! কিন্তু আগে আমিই সাঁকো পার হব!'

রবিন মাথা নেড়ে বললেন, 'আরে রামঃ! তাও কি হয় দাদা?'

—'তাহলে এসো ভায়া, আবার খেলা শুরু হোক!'

আবার শুরু হল লাঠালাঠি। প্রথমেই রবিনের লাঠি পড়ল গিয়ে দানবের টাকের উপরে, ঠকাং করে! অন্য কারুর কমজোরি টাকা হলে তখনই ফটাং করে ফেটে চুরমার হয়ে যেত।

আবার রাগে অজ্ঞান হয়ে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দানব বললে, 'অ্যাঁ! টাকে লাঠি? দেখ। তবে মজাঁটা!'

তার লাঠি পড়ল গিয়ে রবিনের পায়ের উপরে এবং টাল সামলাতে না পেরে তিনিও ঝুপ করে ঝাঁপ খেলেন নদীর জলে!

একগাল হেসে দানব বললে, 'এই আমি প্রথমেই নদী পার হলুম! কিন্তু, তুমি কোথায় হে?'

—'আমিও তোমার সঙ্গেই নদী পার হয়েছি, তবে হেঁটে নয়, সাঁতরে!' নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে রবিন হাসতে হাসতে বললেন!

দানব বললে, 'বহুৎ আচ্ছা! তোমার সঙ্গে লড়াই করেও সুখ!'

রবিন বললেন, 'দানব, আমিও তোমার মতন খেলোয়াড় দেখিনি! বাহাদুর!'

দানব বললে, 'আমার নাম, দানব নয়। লোকে আমাকে খুদে জনার্দন বলে ডাকে।'

—'তুমি খুদেই বটে। থাকা হয় কোথায়?'

—'এতদিন থাকতুম রঘুনাথপুরেই। কিন্তু রাঘব রায়ের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি!'

—'তোমার অবস্থা দেখছি আমারই মতো। কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

—'আপাতত রবিডাকাতের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

—'কেন?'

—'আমি তার দলে নাম লেখাব।'

—'বেশ, তবে আমার হাতে হাত দাও।'

—খুদে জনার্দন চমকে বললে, 'তার মানে?'

—'তার মানে, আমিই হচ্ছি রবিডাকাত।'

—'বলো কী হে?'

—'হ্যাঁ গো ছোট্ট মানুষটি! রাজি আছ?'

—'রাজি। কিন্তু আমার রসদ জোগাতে পারবে তো? রোজ আমি একটা পাঁঠা, আড়াই সের চালের ভাত, এক সের আটার রুটি, দু-বেলায় পাঁচ সেরা দুধ আর এক সেরা গাওয়া ঘি খাই! তার ওপরে টুকিটাকি জলখাবার তো আছেই!'

বিস্ফারিত চোখে রবিন বললেন, 'বলো কী হে খুদে জনার্দন? তবে কি কেবল তোমার পেট ভরাবার জন্যেই আমাদের দিন-রাত শিকার আর ডাকাতি করতে হবে?'

খুদে জনার্দন হেসে ফেলে বললে, 'ভয় পেয়ো না রবি, ভয় পেয়ো না! আচ্ছা, নিজের খোরাক আমি নিজেই জোগাড় করে নেব। আজ থেকে আমি তোমারই। আমাকে বিশ্বাস করবে তো?'

—'সেটা দু-দিনেই বোঝা যাবে! রাঘব রায় শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করতে আসবে, তখন দেখব তুমি কেমন বাহাদুর!'

—'রবি, আমি খালি লাঠি খেলতেই জানি না, ধনুক টানতেও আমি তোমার চেয়ে কম-মজবুত নই! কিন্তু ভায়া, খুব দূর থেকে মাংস-রাঁধার গন্ধ ভেসে আসছে না? আহা, কী ভুরভুরে গন্ধ।' খুদে জনার্দন শূন্যে নাক তুলে গন্ধ শুঁকতে লাগল সশব্দে,—নিশ্বাস টেনে টেনে!

রবিন হেসে বললেন, ‘আশ্চর্য তোমার ঘ্রাণশক্তি! আমাদের আডা এখানে থেকে প্রায় দু-পোয়া পথ—মাংস রাঁধা হচ্ছে সেইখানেই!’

খুদে জনার্দন বললে, ‘তাহলে আর দেরি কোরো না রবি, আমাকে তাড়াতাড়ি তোমাদের আড্ডায় নিয়ে চলো!’

এইভাবে দিন দিন নতুন নতুন লোক এসে রবিনের দলে যোগ দিতে লাগল। দেশে ধনীদের অত্যাচার যত বাড়ে, রবিনের দল ততই ভারী হয়ে ওঠে। এবং রবিনও সুবিধা পেলেই বন থেকে বেরিয়ে অত্যাচারীদের উপরে হানা দেন। কিন্তু ডাকাতির টাকা তিনি নিজের জন্যে জমিয়ে রাখতেন না, যত সব অত্যাচারিত দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

মোহান্ত রামগিরি আর জমিদার রাঘব রায় দেখলে, ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে, অবিলম্বে রবিডাকাতকে বন্দি বা হত্যা করতে না পারলে দেশ থেকে তাদের প্রভুত্ব একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে!

তারা তখন দলবল নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল।

ছুটন্ত তরবারি ও অদৃশ্য চক্ষু

মোহান্ত রামগিরি অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, 'রাঘব, আর দেরি করা ভালো নয়। তুমি আজকেই পঞ্চাশজন সেপাই নিয়ে গিয়ে রবিডাকাতের দর্পচূর্ণ করে এসো!'

রাঘব রায় বললে, 'যে আজ্ঞে প্রভু!'

কিন্তু দেশের সর্বত্রই ছিল রবিনের চর! শত শত গরিব, রবিনের কাছ থেকে প্রায় নানারকম সাহায্য। সুতরাং, তাঁর কাছে গিয়ে রাঘব রায়ের খবর পৌঁছোল-রাঘব রায় আসবার ঢের আগেই।

সুন্দরবনের এঅঞ্চলের সমস্ত পথঘাট ছিল রবিনের নখদর্পণে। তিনি স্থির করলেন, এবারে রাঘবকে এমন মজার ফাঁদে ফেলবেন, জীবনে সে যা কখনও ভুলতে পারবে না!

তাঁর দলে তখন ত্রিশজন লোক ভরতি হয়েছে। সকলকে নিয়ে তিনি এক জায়গায় গিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, বনের ভেতরে আসবার পথ এই একটি ছাড়া আর নেই। সুন্দরলাল, পথের ওপরে তুমি একখানা তরোয়াল রেখে দাও। তারপর এসো, আমরা লুকিয়ে পড়ি।'

ওদিকে অশ্বারোহী রাঘব রায়ের সঙ্গে পঞ্চাশজন সেপাই বনের ভিতরে প্রবেশ করলে। সেপাইদের পরনে সাঁজোয়া-পোশাক, রাঘব রায়েরও মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে বর্ম। সবাই যেন রীতিমতো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ।

গহন বন । চারিধারে সুঁদরি গাছের ভিড়, উপরে জড়ানো লতাপাত, নীচে দুই পাশে অন্ধকার ঝোপঝাপ, জঙ্গল।

আগে আগে আসছে রাঘব। হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে সে বললে, ‘পথের ওপরে ওটা কী চকচক করছে, দেখ তো রে!’

একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বললে, ‘হুজুর, একখানা তরোয়াল!’

—‘ওখানা তুলে আন তো!’

সেপাই যত হাত বাড়ালে, অমনি বনের কোথা থেকে কথা শোনা গেল, ‘তরোয়াল নিয়ো না। মরা লোক তরোয়াল নিয়ে কী করবো?’

সেপাই আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল-তারোয়ালখানা যেন জ্যান্ত কেউটে!

রাঘব চিৎকার করে বললে, শিগগির নিয়ে আয় তরোয়ালখানা! আরে মোলো, গলার আওয়াজ শুনে তুই ভয় পাস?’

সেপাই আবার হেঁট হয়ে হাত বাড়ালে—আবার কে বললে, ‘ও তারোয়াল ছুঁয়েছ কী মরেছ—ছুঁয়েছ কী মরেছ।’

সেপাই কাঁপতে কাঁপতে বললে, ‘হুজুর, আমি পারব না! ও ভূতুড়ে তরোয়াল!’

রাঘব বললে, ‘ভিতু গাধা! ধর আমার ঘোড়াটাকে! আমি নিজেই নেমে ওখানা তুলে আনছি দেখ!’ ঘোড়া থেকে নামবার জন্যে রাঘব যেমন একখানা পা তুললে, অমনি কোথা থেকে একটা তির এত জোরে তার শিরস্ত্রণের উপরে এসে লাগল যে, সে একেবারে ঠিকরে ধপাস করে মাটির উপরে লম্বা হয়ে পড়ল!

ঠিক সেই সময়ে তরোয়ালখানা আচম্বিতে জীবন্ত হয়ে সাৎ করে একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল! সেপাইরা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পালাতে শুরু করলে!

চটপট উঠে দাঁড়িয়ে রাঘব চেঁচিয়ে বললে, ‘এসব হাতের চালাকি, হাতের চালাকি! ওরে গাড়োলের দল, ফিরে আয়! তরোয়ালে নিশ্চয় সুতো বাঁধা ছিল! ওই ঝোঁপে, ওই ঝোঁপে! ওইখানে কেউ লুকিয়ে আছে!’

জন দশ-বারো সেপাই নিয়ে রাঘব ঝোঁপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল- কিন্তু কেউ সেখানে নেই। তারা তরোয়াল বার করে এঝোঁপে ওঝোঁপে আঘাত করতে লাগল।

সেখানে আলো খুব কম। হঠাৎ কোথা থেকে বিকট স্বরে জাগল এক অট্টহাসি-হা হা হা! হা হা হা হা হা!

কে হাসছে, কোথায় হাসছে, কিছু বোঝা গেল না।

এমন বিশ্রী সেই হাসি যে, রাঘবও মনে মনে ‘দুর্গা দুর্গা’ না বলে থাকতে পারলে না।

একজন সেপাই কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, ‘ভূত, ভূত। ভূতে হাসছে!’

রাঘব বললে, ‘ভূতের নিকুচি করেছে! এসব সেই রবিডাকাতের চালাকি! ব্যাটাকে একবার যদি ধরতে পারি!’

সকলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আরও ঘন বনে গিয়ে ঢুকল-দিনের বেলাতেই সেখানে যেন ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার ছায়া!

হঠাৎ একটা গাছের উপর থেকে একটা ফাঁশকল নেমে এসে একজন সেপাইয়ের গলার উপরে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল, তার দেহ ঝুলছে গাছের টঙে!

অন্যান্য সেপাইরা ভয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাঘব ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গিয়ে তরোয়াল দিয়ে দড়ি কেটে দিলে, ঝুলন্ত দেহটা মাটির উপরে পড়ে আধমরার মতো হয়ে রইল।

রাঘব হাঁকলে, ‘শিগগির তোরা ওই গাছের উপরে ওঠ! দেখ—ওখানে কে আছে?’

কিন্তু সেখানেও কারুকে পাওয়া গেল না।

খুঁজতে খুঁজতে সবাই এক নদীর ধারে গিয়ে পড়ল। ছোটো নদী, কিন্তু খুব গভীর, প্রখর স্রোত। নদীর উপরে রয়েছে দুটো বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি। তাদের মাঝখানে আড়াআড়ি বাঁশের পর বাঁশ বেঁধে আনাগোনার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে।

রাঘব দলবল নিয়ে সাঁকোর উপরে গিয়ে উঠল। তারা যখন মাঝবরাবর এসেছে, হঠাৎ আড়াল থেকে কে চ্যাঁচালে-‘হেঁইও জোয়ান! মারো দড়িতে টান!’

অমনি গাছের গুঁড়ি দুটো সরে গেল দুইদিকে, বাঁশগুলোর সঙ্গে সঙ্গে রাঘব ও তার দলের আর সবাই ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়ে ডুবে গেল এবং তারপর ভেসে উঠল।

রাঘবের ঘোড়া প্রভুকে নিয়ে তীরে উঠল তাই, নইলে এযাত্রা আর তার রক্ষা ছিল না। কারণ, সাঁতার জানত না সে। একজন সেপাই জলের টানে কোথায় ভেসে গেল, বাকি সবাই হাবুডুবু খেতে খেতে কোনওরকমে ডাঙায় এসে উঠে পড়ল।

এমন সময়ে দেখা গেল নদীর ওপারে রবিনকে, তার ডান পাশে খুদে জনার্দন ও বাঁ পাশে সুন্দরলাল! হাসতে হাসতে তারা যেন গড়িয়ে পড়ছে!

রাঘব চিৎকার করে উঠল, ‘ওই সেই শয়তান, ওই সেই শয়তান! হাতে নে ধনুক, ছোড় বাণ!’

রবিন বললেন, ‘ওরে হতভাগা রাঘববোয়াল! কেউ ধনুকে হাত দিলেই প্রাণে মারা পড়বি! তোদের চারিদিকের জঙ্গলে আমার লোকেরা ধনুকে বাণ জুড়ে অপেক্ষা করছে।...এখন শোন আমার কথা। জ্যান্ত অবস্থায় এই বন থেকে বেরুতে চাস তো, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যা।’

রাঘব দাঁত খিঁচিয়ে বললে, ‘কী! ফিরে যাব? কখনও নয়! আগে তোকে ধরে শূলে চড়াই, তারপর ফিরে যাবার কথা!’

রবিন বললেন, ‘বটে? ফিরে যাবি না? বেশ! সন্ধ্যার পরেও যদি তোদের এই বনের ভেতর দেখি, তাহলে আর আমি কারুর ওপরে দয়া করব না।’

রাঘব বললে, ‘বাণ ছোড়, বাণ ছোড়। কুকুর তিনটিকে মেরে ফেল।’

কিন্তু ধনুকে বাণ জোড়বার আগেই তিন মূর্তি আবার জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হল! তাদের পিছনে যাবারও উপায় নেই, কারণ মাঝে রয়েছে খরস্রোতা নদী।

চারিদিক নির্জন। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। যদিও রাঘব বেশ অনুভব করতে পারলে যে, দিকেদিকে অদৃশ্য সব চক্ষু তাদের সকলের উপরে দিচ্ছে সতর্ক পাহারা!

অরণ্যের বিভীষিকা

ব্যাপার স্যাপার দেখে দু জন সেপাই জঙ্গল ছেড়ে লম্বা দিলে। একজন সেপাই জলে ভেসে গিয়েছে। বাকি সাতচল্লিশজনকে নিয়ে রাঘব এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলে।

শীতকালের কুয়াশাময় সন্ধ্যা। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই বনের ভিতরটা অন্ধকারের চাদরে মুড়ে দিলে। মাথার উপরে শোনা গেল প্যাঁচাদের চিৎকার, বাদুড়দের ডানা ঝটপট,-দূর থেকে জেগে উঠল বাঘেদের গর্জন!

অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে, শীত ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বনে পাতায় পাতায় কাঁদুনি তুলে শীতার্ত বাতাস ফেলছে কনকনে দীর্ঘশ্বাস! সেপাইরা কাঁপতে কাঁপতে শুকনো ডাল পাতা ঘাস কুড়িয়ে এনে চকমকি ঠিকে আগুন জ্বাললে।

জনকয় লোককে পাহারায় নিযুক্ত করে রাঘব বললে, ‘ডাকাতব্যটাদের আর কোনও সাড়া নেই, ব্যাটারা আমাদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে! আমরা কিন্তু তাদের না-ধরে ছাড়ব না!’

যাঁহাতক এই কথা বলা, অমনি খুব কাছ থেকেই স্তব্ধতার ঘুম ভাঙিয়ে ব্যঙ্গ হাসি জাগল-‘হা হা হা হা হা! হি হি হি হি হি!’

সেপাইদের বুকের ভিতরে শীতের কাঁপুনির চেয়ে ভয়ের কাঁপুনি বেড়ে উঠল। যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । একজন বললে, সোঁদরবনের ভূতরা সবাই জেগে উঠেছে!’

আর-একজন বললে, ‘বাঘরা যাদের ঘাড় ভেঙেছে, এ হাসি তাদেরই! ওই শোনো!’

চারিদিকে, দূরে কাছে কারা সব কাঁদছে-কেউ ফুঁপিয়ে, কেউ চেঁচিয়ে! সেপাইদের যারা শুয়েছিল তারা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল! তারপরেই আবার হো হো হা হা অট্টহাস্য!

একজন সেপাই বললে, ‘প্রাণ নিয়ে যদি ফিরতে পারি, মা-কালীকে জোড়া পাঁঠা দেব!’

রাঘব বললে, ‘থাম পাজি, থাম! এসবই ডাকাতদের চালাকি!’

মুখে এই কথা বললে বটে, কিন্তু তারও গলার আওয়াজ কাঁপছিল!

আরও ঘণ্টা দুই কাটল। কিন্তু আর হাসি কান্নার শব্দ শোনা গেল না।

রাঘব কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে এক প্রহরী এসে বললে, 'হুজুর, দাঁড়িয়ে উঠে দেখুন, খুব দূরে বড়ো একটা আগুন জ্বলছে।'

রাঘব দেখে, খানিকক্ষণ ভেবে বললে, ঠিক হয়েছে! ব্যাটাদের এইবারে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! নিশ্চয় ওখানেই আছে ডাকাতদের আড়া! ওরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে আমার সুযোগ!'

তখন সেপাইদের জাগানো হল। তারা হাতিয়ার নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রাঘব বললে, 'সবাইকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না, তাহলে গোলমাল হতে পারে! কেবল জনপঁচিশ বাছা বাছা লোক পা টিপে টিপে এগিয়ে চলুক, বাকি সবাই এখানে থাক।'

পঁচিশজন লোক নিয়ে রাঘব খুব সাবধানে অগ্রসর হল। খানিক দূর থেকে উকি মেরে দেখে বাোঝা গেল, একটা অগ্নিকুণ্ডকে চক্রাকারে ঘিরে অনেকগুলো মূর্তি কাপড়-মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। মূর্তিগুলোকে আগুনের ম্লান আভায় ভালো করে দেখা যায় না; কিন্তু সেগুলো যে মানুষের মূর্তি, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই!

সেপাইরা যখন আগুনের কাছ থেকে হাত-পঞ্চাশ তফাতে এসে পড়েছে, রাঘব তখন হুকুম দিলে, 'এইবার দৌড়ে গিয়ে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ো! সবাইকে কুচি কুচি করে কেটে ফ্যালো।'

জঙ্গল ভেদ করে সেপাইরা তিরবেগে ছুটতে আরম্ভ করলে এবং তার পরেই সবাই হুড়মুড় করে হল পপাত ধরণীতলে! অন্ধকারে কেউ

দেখতে পায়নি যে, রবিন সেখানে ঝোপের ভিতরে হাঁটু সমান উঁচু করে বেঁধে রেখেছিলেন খুব লম্বা এক কাছি! রাঘবের লোকেরা পরস্পরের ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়ল, পরস্পরকে গলাগলি দিতে ও পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে লাগল, কারণ, অন্ধকারে অন্ধ হয়ে তারা ধরে নিলে যে, রবিডাকাতের দলই তাদের আক্রমণ করছে!

তারপর সত্যসত্যই রবিন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেপাইদের ঘাড়ের উপরে দুইদিক থেকে লাফিয়ে পড়লেন-প্রত্যেকেরই হাতে একগাছা মোটা লাঠি!

রবিনের হাতে বেদম মার খেয়ে রাঘব প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়ল। যখন ভালো করে সব বুঝতে পারলে তখন দেখলে, তার ও সেপাইদের হাত-পা শক্ত করে বাঁধা!

রবিন বললেন, ‘খুদে জনার্দন, সুন্দরলাল, রামু! এ হতভাগারা কেউ যদি টুঁ শব্দ করে, তাহলে তোমরা ডান্ডা চালাতে কসুর কোরো না! আর সবাই আমার সঙ্গে এসো, বাকি সেপাইগুলোকে শিক্ষা দিতে হবে।’

বাকি বাইশজন সেপাইও অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, রবিনের দল তাদের উপরে গিয়ে পড়ল বিনামেঘে বজ্রের মতো! তারাও হল বন্দি!

রবিন বললেন, ‘এদের সাঁজোয়া পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে জমা করে রাখো! কী রাঘব, ওদিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? ভাবছ, আমাদের দলের অনেকে এখনও আগুন পোয়াতে পোয়াতে আরামে ঘুমোচ্ছে? মোটেই নয়, মোটেই নয়! ওগুলো মানুষ নয়, কাপড়-জড়ানো খড়ের আঁটি! তুমি এসেছিলে এদেরই আক্রমণ করতো!’

রাঘব দাঁত কিড়মিড় করে বললে, ‘বুনো শেয়াল, গর্তের ছুঁচো, হতভাগা জোচ্চোর!’

রবিন বললেন, ‘চুপ করে থাক! ফের যদি কথা কইবি, গাছে তুলে তোকে ফাঁসিতে লটকে দেব!... হ্যাঁ, ভালো কথা! সুন্দরলাল, রাঘব আর সেপাইদের পোশাকগুলোও খুলে নাও! সবাইকে পরিয়ে দাও খালি একটা করে নেংটি। কনকনে শীতে ওদের ভারী আরাম হবে!’

সেপাইরা বাধা দেবার চেষ্টা করলে না, বাধা দেবার শক্তিও তাদের ছিল না। নেংটি পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হি হি করে কাঁপতে লাগল- তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধা!

রাঘবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রবিন বললে, ‘গরিবের যম রাঘব রায়! এখন তোমার কেমন লাগছে? কথা কইছ না যে বড়ো? জানি, তুমি যদি আমাদের আজ ধরতে পারতে, তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই হত শূলদণ্ড! কিন্তু আমি তোমাদের প্রাণভিক্ষা দিলুম, আর কোনও ক্ষতি করলুম না! এখন বেরোও এই বন থেকে-সুন্দরবনে অসুন্দর কুৎসিতের ঠাঁই নেই। রামগিরির কাছে জানাওগে যাও, রবিডাকাত তোমাদের কীরকম অভ্যর্থনা করেছিল!’

আগে আগে পালের গোদা জমিদার রাঘব রায়, পিছনে পিছনে সাতচল্লিশ জন সেপাই--- সকলেরই হাত বাঁধা, পরনে নেংটি, পায়ে জুতো নেই। চলল তারা গুটি গুটি।

সেখান থেকে পুষ্পপুর পনেরো ক্রোশ! শীতে কাঁপতে কাঁপতে, হিমে ভিজতে ভিজতে, দুরু দুরু প্রাণে বাঘের গাঁ গাঁ শুনতে শুনতে কালো রাত পুইয়ে গেল—তখনও তারা চলেছে, চলেছে, আর চলেছে। যে গাঁয়ের ভিতর

দিয়ে তারা যায়, আবালবৃদ্ধবনিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রঘুনাথপুরের বাঘজমিদার, হোমরাচোমরা রাজার সেপাই—এ কী হাল এদের!

দেশে দেশে এই অদ্ভূত কাহিনি ছড়িয়ে পড়ল—চারিদিকেই এক গল্প! কোথাও আর রাঘব রায়ের মুখ দেখাবার উপায় রইল না!

স্বামী ভোজানন্দ

একদিন রবিন, খুদে জনার্দন ও সুন্দরলাল বেড়াতে বেড়াতে বনের বাইরে গিয়ে হাজির! তারপরেই দেখা গেল, ছোট্ট এক নদীর ধারে বসে মাছ ধরছে ভীষণ হৃষ্টপুষ্ট একটি লোক। এমন মোটা মানুষ দুনিয়ায় বোধহয় দুটি নেই—তাকে অনায়াসেই নরহস্তী বলা চলে।

তার পাশে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা গামলা এবং তার ভিতরে রয়েছে একরাশ বড়া—যা দশজন লোকে মিলে খেয়ে সাবাড় করতে পারে না! লোকটির পরনে সন্ন্যাসীর পোশাক। এক মনে বাঁ হাতে ছিপ ধরে সে ডান হাত বাড়িয়ে এক-একখানা বড়া নিয়ে মুখের ভিতরে ফেলে দিচ্ছে!

রবিন বললেন, 'মৎস্য-শিকারি সন্ন্যাসী! আশ্চর্য! একেই বলে কলিকাল! ওহে, তোমরা এই ঝোপে গা ঢাকা দাও, লোকটাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখে আসি!'

রবিন পায়ে পায়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার নাম কী হে?'

সন্ন্যাসী ছিপ থেকে চোখ না তুলেই বললে, 'স্বামী ভোজানন্দ।'

—'সন্ন্যাসী হয়ে তুমি মাছ ধরছ?'

—‘খালি মাছ ধরছি না, মাংসের বড়াও খাচ্ছি!’

—‘চমৎকার!’

—‘এক সময়ে সন্ন্যাস নিয়ে আমি মঠে বাস করতুম বটে। কিন্তু পালে-পর্বে উপোস করে করে আমার দেহ হয়ে পড়েছিল নেংটি ইঁদুরের মতো। তাই মঠ ছেড়েছি বটে, কিন্তু এই গেরুয়া কাপড়চোপড়গুলো ছাড়তে পারিনি—বহুকালের বদ অভ্যাস কিনা!’

রবিন হঠাৎ তরোয়াল বার করে তার ডগাটা ভোজানন্দের বুকের কাছে ধরে বললেন, ‘এখন ছিপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াও তো বাপু! পাছে আমার পা ভিজে যায়, সেই ভয়ে আমি নদী পার হতে পারছি না! আমাকে কাঁধে করে নদীর ওপারে নিয়ে চলো!’

তরোয়াল দেখে স্বামী ভোজানন্দ একটুও ভড়কে গেল না। গভীর স্বরে বললে, নদীর এপারে রয়েছে আমার মাংসের বড়া। ওপারে আমি যাব কেন?’

—‘হয় আমাকে পার করে দাও, নয়—’

—‘আচ্ছা বৎস, তাই হবে!’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোজানন্দ দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর হেঁট হয়ে বললে, ‘নাও বাপধন, দয়া করে তাড়াতাড়ি পিঠে চড়ো!’

রবিন তার পিঠে চড়লেন, কিন্তু তরোয়ালখানা খাপে পুরলেন না। ভোজানন্দ জলে নামল—নদী গভীর নয়, জল তার বুক পর্যন্ত উঠল মাত্র।

ম্রিয়মাণ ভাবে সে বললে, ‘দিনকাল ভারী খারাপ। শান্তিতে বসে দু-খানা মাংসের বড়া খাবারও জো নেই। কোন পাজির পা ভিজে যাবে, সেইজন্যে তাকে আবার কাঁধে তুলে নদী পার করে দিতে হবে!’

রবিন কিছু বললেন না, খালি হাসতে লাগলেন।

ভোজানন্দ ওপারে গিয়ে উঠল। রবিন তার পিঠ ছেড়ে নেমে পড়লেন। হঠাৎ ভোজানন্দ খপ করে হাত বাড়িয়ে রবিনের হাত থেকে তরোয়ালখানা কেড়ে নিয়ে বললে, 'বৎস, এইবার আমার পালা। হয় আমাকে কাঁধে করে আমার মাংসের বড়ার কাছে নিয়ে চলো, নয় খেলে এই তরোয়ালের খোঁচা।'

ভোজানন্দের মুখ দেখেই রবিন বুঝলেন 'না' বলে কোনওই লাভ নেই। তিনি হেঁট হলেন, ভোজানন্দ এক লাফে তাঁর পিঠে চড়ে বসল—সেই নরহস্তীর বিপুল বপু ওজনে বোধহয় পাঁচ মনের কম নয়!

ভোজানন্দ বললে, 'আমাকে খাবারের কাছে নিয়ে চলো, তাড়াতাড়ি খাবারের কাছে নিয়ে চলো!'

ওদিকে ঝোপের ভিতর থেকে সর্দারের অবস্থা দেখে খুদে জনার্দন আর সুন্দরলাল হেসে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল!

এপারে এসে ভোজানন্দের জ্যান্ত পাহাড়ের মতন দেহ যখন পিঠ ছেড়ে নীচে নামল, রবিন ধাঁ করে তার ভুঁড়িতে বসিয়ে দিলেন দশ মন ওজনের এক লাথি। ভোজানন্দের বিশাল ভুঁড়ি কোনওরকম সে চোট সামলে নিলে বটে, কিন্তু হাতের তরোয়াল মাটিতে ফেলে সে হা হা করে হাঁপাতে লাগল, ঠিক যেন হাপরের মতো!

তরোয়ালখানা কুড়িয়ে নিয়ে রবিন বললেন, 'এখন খাবারের কথা ভুলে যাও ভোজানন্দ বাবাজি! শিগগির আমাকে ওপারে নিয়ে চলো, নইলে তোমার কান নেব কেটে!'

ভোজানন্দের মুখে আনন্দের কোনও লক্ষণই প্রকাশ পেলে না! বিনাবাক্যব্যয়ে রবিনকে কাঁধে নিয়ে আবার সে নদীতে নামল। তারপর

নদীর ঠিক মাঝখানে গিয়ে হঠাৎ হেঁট হয়ে এমন এক ঝাঁকানি মারলে যে রবিন ডিগবাজি খেয়ে ঝপাং করে জলের ভিতরে গিয়ে পড়লেন!

ভোজানন্দ বললে, 'যা নচ্ছার, যা! হয় ডুবে মর, নয় সাঁতরে তীরে ওঠ! আমি মাংসের বড়া খেতে চললুম।'

রবিন ডাঙায় উঠে দেখলেন, ভোজানন্দ দুই পা ছড়িয়ে বসে কোলের উপরে বড়ার গামলা টেনে নিয়েছে।

ভোজানন্দ বললে, 'দূর হ দুরাত্মা, দূর হ! আমাকে শান্তিতে বড়া খেতে দে। নইলে এই গামলা ভাঙব তোরই মাথায়!'

রবিন খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, 'স্বামী ভোজানন্দ, আর ঝগড়া নয়—তোমার সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই।'

—'তোমার নাম কী বাপু?'

—'রবিন চৌধুরি—লোকে ডাকে, রবিডাকাত বলে!'

এক লাফে ভোজানন্দ দাঁড়িয়ে উঠল। হাতি যে এমন চটপট লাফ মারতে পারে, রবিনের সে ধারণা ছিল না।

ভোজানন্দ বিপুল বিস্ময়ে বললে, 'কী! তুমিই রাঘব রায়কে নেংটি পরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলে? তোমারই পিঠে চড়েছি আমি?'

রবিন বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ভুলে যেয়ো না বাবাজি, আমিও তোমার পিঠে চড়েছি! এখন তোমার মত কী? আমার সঙ্গে যেতে চাও?'

—'কোথায়, তোমাদের আড্ডায়? নারাজ নই, কিন্তু সেখানে আমার খ্যাঁট জুটবে কি? রোজ আমার দশ সের করে মাংস চাই।'

—'হে আদর্শ স্বামীজি, তোমাকে আমি রোজ একটা করে হাতি মেরে খাওয়াব। তোমার মতন রত্নকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না! তোমার খোরাক জোগাবার জন্যে আমরা সবাই উপোস করতেও রাজি!'

—‘আচ্ছা, আমিও রাজি!’

—‘ওহে খুদে জনার্দন, ওহে সুন্দরলাল! ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে দ্যাখো, আমাদের দলে ভরতি হল এক সাধু-ডাকাত!’

তারা দু-জনে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। খুদে জনার্দনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ভোজানন্দ বললে, ‘রবি, এই খোকা-তালগাছটিকে কোত্থেকে জোগাড় করলে হে? এ খাোকাকে দুধ খাওয়াবার মতন ঝিনুক তোমাদের আড্ডায় আছে তো?’

খুদে জনার্দন খাপ্পা হয়ে বললে, ‘কী বলব নরহস্তী, তুমি নাকি সন্ন্যাসী, নইলে এই লাঠির বাড়ি মেরে তোমাকে শায়েস্তা করতুম!’

—‘তাই নাকি খোকাবাবু, তাই নাকি? লাঠি খেলার কায়দা আমারও কিছু কিছু জানা আছে, পরীক্ষা করতে চাও?’

রবিন বুললেন, 'এখানে নয়, এখানে নয়, আড্ডায় ফিরে সে পরীক্ষা হবে অখন!

তিনকড়ি সামন্তের কাণ্ড

রামু গিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে ময়নাপুরে, তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে।

সুন্দরবনে ফিরে এলে পর রবিন তাকে শুধোলেন, ‘রামু বাইরের কোনও নতুন খবর আছে?’

রামু বললে, ‘কর্তা, শুনলুম, পুষ্পপুরে মস্ত এক মেলা বসেছে। আজ তিন দিন ধরে মেলা চলছে। কুস্তি, লাঠি, ছোরা, তরোয়ালখেলা হয়ে গেছে! কাল ধনুকবাণ নিয়ে লক্ষ্যভেদের পালা। সবচেয়ে বড়ো তিরন্দাজকে একটি

রুপোর তূণ উপহার দেওয়া হবে। বিচার করবেন কুমার রুদ্রনারায়ণ নিজে।'

রবিনের আগ্রহ জেগে উঠল তৎক্ষণাৎ। তিনি বললেন, 'উপহারের কথা শুনে লোভ হচ্ছে। কিন্তু শুনেছি, নগরপাল অনন্তরামের লোক চন্দ্রলাল খুব ভালো তিরন্দাজ। নিশ্চয় সে-ও মেলায় থাকবে?'

রামু বললে, 'লোকে বলছে, এবারে নাকি চন্দ্রলালের চেয়ে ভালো তিরন্দাজ বাহাদুরি দেখাতে আসবে!'

'কে সে?'

—'তার নাম গোবিন্দ, সে খোদ কুমার রুদ্রনারায়ণের লোক। লোকে বলাবলি করছে, তির ছুড়ে সে নাকি মেঘ বিঁধতেও পারে!'

স্বামী ভোজানন্দ বললে, 'সিদ্ধি খেলে আমারও মনে হয়, বাণ ছুড়ে আমি আকাশের চাঁদকেও ছ্যাঁদা করে দিতে পারি!'

সকলে হেসে উঠল!

রবিন কিন্তু গম্ভীর। ভাবতে ভাবতে তিনি বললেন, 'এই তির ছোড়া পাল্লায় আমারও যোগ দিতে সাধ হচ্ছে। কুমার রুদ্রনারায়ণ যদি নিজের হাতে আমাকে রুপোর তূণ দিতে বাধ্য হন, তাহলে সেটা বড়ো যে-সে কথা হবে না!'

খুদে জনার্দন বললে, 'কিন্তু কুমার রুদ্রনারায়ণই বলেছেন, তোমাকে ধরতে পারলে তিনি পঞ্চাশ মোহর বকশিশ দেবেন, এটাও যেন ভুলে যেয়ো না।'

সুন্দরলাল বললে, 'কর্তা, নগরপাল অনন্তরাম যে মোহান্ত রামগিরির ভাই, এটাও আপনি জানেন তো?'

রবিন বললেন, ‘সবই জানি, কিছুই ভুলিনি! তবু ভিড়ের সঙ্গে মিশে মেলাটা দেখতে যেতে দোষ কী? আমাদের ভাঁড়ারে ছদ্মবেশের অভাব তো নেই! কী বলো, তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে নাকি?’

চারিদিকে আনন্দের ধ্বনি জাগিল—‘বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!’

পরদিন সকালে সূর্য ওঠবার আগেই সকলে উঠেপড়ে মহা উৎসাহে আপন আপন চেহারা বদলাবার চেষ্টায় লেগে গেল। কেউ সাজলে ক্যাংরাগুঁফো মাড়োয়ারি, কেউ সাজলে গালপাট্টাওয়ালা পাঁড়েচোবে, কেউ সাজলে ঝুঁটিবাঁধা উড়িয়া, কেউবা চাষা; কেউবা মজুর! স্বামী ভোজানন্দ চলল, সন্ন্যাসী সাজেই। খুদে জনার্দন দু-খানা নির্ভর-যষ্টি নিয়ে খোঁড়া ভিখারি হয়ে পড়ল।

মেলায় হাজির হয়ে সবাই দেখলে, চারিদিক লোকে লোকরণ্য! রাজ্যের সব শ্রেণির লোকই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে।

একদিকে রুপোর ঝালর ঝোলানো চাঁদোয়ার তলায় সিংহাসনের উপরে গম্ভীর মুখে বিরাজ করছেন রাজভ্রাতা কুমার রুদ্রনারায়ণ। তাঁর দুই পাশে যথাযোগ্য আসনে বসে আছেন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সভাসদর। সেখানে নগরপাল অনন্তরাম, তাঁর দাদা মোহান্ত মহারাজ রামগিরি ও রাঘব রায়কে দেখা গেল।

তির ছোড়ার পাল্লা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা ছেঁড়াখোড়া ময়লা কাপড় জমাপরা বুড়ো লোক একমাথা সাদাচুল ও ধনুকবাণ নিয়ে হন্তদন্তের মতো ক্রীড়াক্ষেত্রের দরজার কাছে এসে হাজির হল।

সেখানে বসে একজন কেরানি, প্রতিযোগীদের কথা খাতায় লিখে রাখছিল। সে মুখ তুলে বললে, ‘কে তুমি বুড়ো? এখানে কী চাও?’

—'তির ছোড়ার পাল্লায় যোগ দিতে চাই।'

কেরানি তো হেসেই অস্থির! তারপর বললে, 'ওই বুড়ো হাতে তুমি ধনুকের ছিলে টানতে পারবে?'

বুড়ে বললে, 'পারি কি না-পারি, পরখ করেই দেখুন না!'

কেরানি বললে, 'সে আর হয় না। প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে।'

বুড়ো কাঁচুমাচু মুখে মিনতি করে বললে, 'মশাই, আমি বুড়োমানুষ; বিশ ক্রোশ পথ ভেঙে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে! দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না!'

হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে কেরানির মাথায় এক খেয়াল জাগল। সে বললে, 'আকাশ দিয়ে ওই যে চিলটা উড়ে যাচ্ছে, তুমি ওকে তির মারতে পারো?'

কেরানির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বৃদ্ধ ধনুকে তির লাগিয়ে ছিলা টেনে ছেড়ে দিলে। তিরবিদ্ধ চিলটা ঘুরতে ঘুরতে ক্রীড়াক্ষেত্রের একপাশে ঠিক রুদ্রনারায়ণের সামনে এসে পড়ল!

রুদ্রনারায়ণ সচমকে মুখ তুলে বললেন, 'এ কী ব্যাপার! কে চিলটাকে মারলে?'

কেরানি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, ওই বুড়ো, উড়ন্ত চিলটাকে মেরেছে! এতক্ষণ পরে এসে, ও তিরছোড়া পাল্লায় নাম লেখাতে চায়! তবে ওর টিপ আছে বটে!'

রুদ্রনারায়ণ বললেন, 'টিপ আছে না ছাই আছে! দৈবগতিকে চিলের গায়ে তির লেগে গেছে! একে তালবুড়ো, তায় ওই তো হাঘরের মতন চেহারা! ও আবার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে!'

বুড়ো চেঁচিয়ে বললে, ‘পরীক্ষা করুন হুজুর, দয়া করে পরীক্ষা করুন। এরাজ্যের যেকোনও লোকের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে রাজি। আমি হচ্ছি, মুকুন্দপুরের তিনকড়ি সামন্ত, আমায় চেনে না কে?’

নগরপাল অনন্তরাম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘বুড়োটা বেজায় গোলমাল বাধিয়েছে, ওকে এখান থেকে দূর করে দাও!’

রুদ্রনারায়ণ বললেন, ‘না, না, ও ভেতরেই আসুক। আর কিছু না হোক, একটু মজা হবে! ওর ভাঁড়ামি দেখে লোকে হেসে খুন হবে!’

তিনকড়ি সামন্ত ক্রীড়া ক্ষেত্রের ভিতরে এসে দাঁড়াল। রুদ্রনারায়ণ ঠিক আন্দাজ করেছেন, তার চেহারা দেখেই সকলে হো হো হাসি শুরু করে দিলে!

তখন শেষ পরীক্ষার প্রথম পাল্লার সময় উপস্থিত হয়েছে। এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছে ষাটজনের মধ্যে কেবল ছয়জন লোক। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে আছে নগরপাল মুকুন্দরামের পেটোয়া চন্দ্রলাল ও রুদ্রনারায়ণের পেটোয়া গোবিন্দও ।

খানিক তফাতে রয়েছে চাঁদমারি । কালো জমির মাঝখানে সাদা চক্র। আবার সাদা চক্রের মাঝখানে কালো বিন্দু।

ছ-জনের মধ্যে প্রথম দু-জনের তির সাদা চক্রের বাইরে গিয়ে পড়ল। আর দু-জনের তির গিয়ে লাগল সাদা চক্রের প্রান্তে ।

তারপর বিখ্যাত তিরন্দাজ চন্দ্রলাল সগর্বে পা ফেলে এগিয়ে এল— প্রতি বৎসরে সেই-ই এঅঞ্চলে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। লক্ষ্য স্থির করে সে বাণ ত্যাগ করলে। বাণ, সাদা চক্রের কালো বিন্দুর এক ইঞ্চি পরে গিয়ে লাগল।

তখন রুদ্রনারায়ণের ইঙ্গিতে গোবিন্দ এসে ধনুক ধারণ করলে। তার বাণ গিয়ে লাগল ঠিক কলো বিন্দুর পাশেই। চারিদিকে ‘ধন্য ধন্য’ রব উঠল।

রুদ্রনারায়ণ ব্যঙ্গহাসি হাসতে হাসতে বললেন, ‘ওহে মুকুন্দপুরের তিনকড়ি সামন্ত! এইবারে তুমিও কার্দানি দেখাবে নাকি?’

তিনকড়ি প্রণাম করে বললে, ‘হুকুম পেলেই কার্দানি দেখাই হুজুর। কিন্তু কী বকশিশ মিলবে?’

রুদ্রনারায়ণ বললেন, ‘ওই রুপের তূণ আর ওর ভেতরে যত ধরে তত মোহর!’ তিনি নিশ্চিত রূপেই জানতেন, এ পুরস্কার লাভ করবে তাঁর অনুগত গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নয়।

তিনকড়ি কোনওরকম লক্ষ্য না করেই অবহেলাভরে ধনুক তুলে বাণ নিক্ষেপ করলে এবং বাণ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার আগেই ফিরে চট করে দাঁড়িয়ে বললে, ‘এ তো ছেলেখেলা!’

পরমুহূর্তেই চারিদিকে গগনভেদী কোলাহল! তিনকড়ির বাণ বিদ্ধ করেছে ঠিক কলো বিন্দুকেই।

রুদ্রনারায়ণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তিনকড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নগরপাল অনন্তরাম বললে, ‘বাণটা দৈবাৎ ঠিক জায়গায় লেগেছে।’

মোহান্ত রামগিরি বললেন, ‘তা নয়তো কী! ও বুড়ো কোথাকার কে, এখানে ওর চালাকি-টালাকি খাটবে না।’

রুদ্রনারায়ণ হাঁকলেন, ‘এইবার সর্বশেষ পরীক্ষা!’

চাঁদমারি আরও তফাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এবারে পাল্লা দেবে খালি তিনজন-চন্দ্রলাল, গোবিন্দ ও তিনকড়ি। বাকি যে চারজনের

বাণ সাদা চক্রের বাইরে বা প্রান্তে গিয়ে পড়েছিল, এবারে তারা আর পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেলে না।

এবারেও প্রথম পালা পড়ল চন্দ্রলালের। অনেকক্ষণ টিপ করে সে ধনুকে টঙ্কার দিলে বটে, কিন্তু তার বাণ সাদা চক্রের বাইরে গিয়েই লাগল।

অনন্তরাম চিৎকার করে উঠল, 'চন্দরের বাণ হাওয়ায় বেঁকে গিয়েছে, ওকে আর একবার সুযোগ দেওয়া হোক!'

রুদ্রনারায়ণ বললেন, 'একবারের বেশি কেউ তির ছুড়তে পারবে না। গোবিন্দ, এইবারে তোমার পালা!'

গোবিন্দ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে লক্ষ্যস্থির করে তির ছুড়লে। তার তির এবারেও কালো বিন্দুর এক পাশে লাগল।

তিনকড়ি ধনুক তুলে বললে, 'হুজুর, আমার ওপরে কী হুকুম? আমি ওই কালো ফোঁটার মাঝখানেও বাণ মেরে, গোবিন্দ তিরন্দাজের বাণকেও কেটে দু-খানা করে দিতে পারি, আবার ওর কাটা বাণটা মাটিতে পড়বার আগেই তাকেও কেটে দু-খানা করা আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়!'

রুদ্রনারায়ণ গর্জন করে বললেন, 'কী! তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস?'

—'ঠাট্টা নয় হুজুর, সত্যিকথা!'

—'কিন্তু যদি না-পারিস তোর শূলদণ্ড হবে।'

—'দয়াল হুজুর, যা বলেন তাই!'

তিনকড়ি ধনুক তুলে এবারে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করলে। তারপর কারুর চোখে পলক পড়তে না পড়তেই বিদ্যুতের মতন হাত চালিয়ে আরও দু-বার ধনুকের ছিল টানলে, সশব্দে!

কোথা দিয়ে কী যে হল কেউ লক্ষ করবার সময় পেলে না।--কেবল দেখা গেল, ঠিক কালো বিন্দুর মাঝখানে তার একটা বাণ বিঁধে রয়েছে এবং গোবিন্দের বাণের অর্ধেকটা আর চাঁদমারির উপরে নেই। পরীক্ষকরা ছুটে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, বাণের কাটা অংশটাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে!

তারপরেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সেই বিরাট জনসমুদ্রের জয়কোলাহল জেগে উঠল।

কুমার রুদ্রনারায়ণ স্তম্ভিতের মতন বসে রইলেন, নিজের চোখকেও তিনি যেন আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, ‘ও তিরন্দাজ নয়—ও হচ্ছে যাদুকর! ওকে পুরস্কার দেওয়া হবে না।’

মোহান্ত রামগিরি প্রতিধ্বনি করে বললেন, ‘ঠিক, ঠিক! তিনকড়ি একটা শঠ যাদুকর! ও পুরস্কারের যোগ্য নয়!’

তিনকড়ি আচম্বিতে ধনুকবাণ তুলে কুমার রুদ্রনারায়ণের বুকের দিকে লক্ষ্যস্থির করে বললে, ‘হয় আপনার তূণ দিন-নয় আমার বাণ নিন!’

রুদ্রনারায়ণের মুখ মড়ার মতন সাদা হয়ে গেল! তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তিনকড়ি বাণ ছাড়লে এই বিপুল জনতার সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করলেও তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করতে পারবে না! কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, ‘তোমার ধনুক নামাও তিনকড়ি, ও মোহরভরা রুপোর তূণ তোমারই! আমি ঠাট্টা করছিলুম!’

তিনকড়ি মাথা নেড়ে বললে, ‘উঁহু, উঁহু! ধনুক নামালে আবার আপনি ঠাট্টা করতে পারেন। কারুকে দিয়ে আগে তূণটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন!’

গজরাতে গজরাতে রুদ্রনারায়ণ বললেন, ‘কেউ গিয়ে বুড়ো গুণ্ডাটাকে তূণটা দিয়ে এসো তো!... ওহে তিনকড়ি, সাবধান। দেখো, বাণটা যেন তোমার হাত ফশকে ছুটে না আসে!’

তিনকড়ি একগাল হেসে বললে, ‘আপনার রুপোর তূণটা পেলেই বাণটা তার ভেতরে রেখে দেব!’

মোহরভরা রুপোর তূণটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রুদ্রনারায়ণের প্রাণের বন্ধু রাঘব রায়! তিনকড়ির সামনে গিয়ে তূণসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে সে বললে, ‘এই নে, তূণ নিয়ে এখনই বিদায় হ!’

তিনকড়ি ধনুক থেকে বাণ খুলে যথাস্থানে রেখে দিয়ে রুপোর তূণটা নেবার জন্যে যেমন সামনের দিকে হেঁট হল, রাঘব রায় অমনি চট করে হাত বাড়িয়ে তার মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই একমাথা পাকা চুল আর দাড়ি খসে পড়ল হাতের টানে!

পরমুহূর্তেই রাঘব চেঁচিয়ে উঠল—‘রবিডাকাত! ছদ্মবেশী রবিডাকাত! ধর, ধর, ওকে ধর!’

সমস্ত ভিড় চারিদিক থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে ভেঙে পড়ল—তারপর সে কী হট্টগোল, কী হুটোপুটি, কী ছুটোছুটি, ঝুটোপুটি, মাথাফাটাফাটি। জনতার মধ্যে কেবল রবিনের সঙ্গীরাই ছিল না, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ অনেক গরিব লোকও ছিল, তারা সবাই ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেললে! সেপাইরা হইহই করে হাতিয়ার নিয়ে তেড়ে এল—কিন্তু খুদে জনার্দন, স্বামী ভোজানন্দ ও রবিনের সাঙ্গাপাঙ্গদের বনবন ঘুরন্ত লাঠির বহর দেখে তাদের সমস্ত উৎসাহ ঠান্ডা হয়ে গেল! কারা ডাকাত আর কারা সাধু, তাও তারা বুঝতে পারলে না; কারণ, জনতার সবদিক থেকেই কেবলই শোনা যাচ্ছে—‘জয়, রবিডাকাতের জয়! জয়, রবিডাকাতের জয়!’

মোহান্ত রামগিরি হতভম্বের মতো বললেন, ‘অ্যা! কালেকালে হল কী—হল কী? ডাকাতের নামে জয়ধ্বনি! হল কী—হল কী?’

রুদ্রনারায়ণ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিতস্বরে বললেন, ‘আর এখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রবিডাকাতের বাণ পথ ভুল করে না!’

দেখতে দেখতে সম্ভ্রান্ত দর্শকদের আসন একেবারে খালি হয়ে গেল।

ভিতরে ভিতরে তখনও চ্যাঁচামেচি ও মারামারি চলছে বটে, কিন্তু যার জন্যে এই হাঙ্গামা, সেই রবিডাকাত ও তার দলবল যে কোন ফাঁকে কখন কোথা দিয়ে সরে পড়েছে, সেখবর কেউ জানতেও পারলে না!

আনন্দের নিরানন্দ

এক গেরুয়া পোশাকপরা, দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কান ও কপাল পর্যন্ত ঢাকা পাগড়ি এবং দীর্ঘ গোঁফদাড়ির ভিতর থেকে তাঁর মুখের অধিকাংশই আবিষ্কার করবার উপায় নেই, কিন্তু তাঁর বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালেই তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে বোঝা যায়।

সন্ন্যাসী বনের পথ ধরে নিজের মনেই কী ভাবতে ভাবতে চলেছেন, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখেন, এক বেজায় ঢ্যাঙা ও আর এক বেজায় মোটা লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ছিপছিপে চেহারার যুবক। এমন ভাবে তারা পথ জুড়ে আছে যে, আর কারুর চলবার উপায় নেই।

সন্ন্যাসী বললেন, ‘পথ ছাড়ো।’

যুবক হেসে বললে, ‘ঠাকুর, নিজের পথ নিজে করে নাও ।’

—‘কে তোমরা?’

—‘আমি রবিডাকাত।’

—‘আমি খুদে জনার্দন।’

—‘আমি স্বামী ভোজানন্দ!’

—‘পথ ছাড়ো। আমি তোমাদের চিনি না।’

রবিন বললেন, ‘ঠাকুর, আমাদের নাম তো শুনলে, এখন তোমার পরিচয় কী বলে দেখি?’

—‘আমার পরিচয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।’

রবিন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীর আলখাল্লা টিপেটুপে পরীক্ষা করতেই ভিতরে ঝন ঝন শব্দে কী বেজে উঠল!

—'ওটা বাজে কী?'

—'তরোয়াল ।'

—'সন্ন্যাসীর কোমরে তরোয়াল!'

স্বামী ভোজানন্দ বললে, 'ভুলে যেয়ো না রবি, ভুলে যেয়ে না! সন্ন্যাসী যখন মাছ ধরতে আর মাংসের বড়া খেতে পারে, তখন তরোয়াল ধারণ করতেই বা পারবে না কেন?'

রবিন হাসিমুখে বললেন, 'ঠিক বলেছ ভোজানন্দ! এই লোকটিও বোধহয় তোমার মতোই সন্ন্যাসী! তারপর প্রভু! কোমরের তরোয়াল গেরুয়ায় চাপা দিয়ে এপথে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বললেন, 'তোমারই কাছে!'

রবিন বিস্মিতভাবে বললেন, 'আমার কাছে! কেন?'

—'শুনেছি, তুমি গরিবের বন্ধু। আমিও গরিবকে ভালোবাসি। তাই তোমার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি ।'

—'গরিবকে কেবল মুখে ভালোবাসলেই হয় না, দীনদুঃখী দুর্বলের জন্য তুমি সর্বস্ব খোয়াতে পারো? প্রাণ দিতে পারো?'

সন্ন্যাসী আরও গম্ভীর, রহস্যময় কণ্ঠে বললেন, 'দীনদুঃখী দুর্বলকে সাহায্য করাই আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম ।'

রবিন একটু ভেবে বললেন, 'প্রভু, পষ্ট কথা বলছি বলে রাগ কোরো না। তুমি গরিবের বন্ধু হতেও পারো। আবার শত্রুদের গুপ্তচরও হতে পারো। কারণ, সশস্ত্র সন্ন্যাসীর কথা শাস্ত্রে লেখে না। তবে আপাতত তুমি

আমাদের সঙ্গে থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু দু-চার দিন ভালো করে না দেখে তোমাকে আমি দলে নিতে পারব না।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'বেশ, তাই হোক।'

ভোজানন্দ তখন কান পেতে কী শুনে বললে, 'রবি, রবি!'

—'কী?'

—'গান গায় কে?'

রবিনও শুনে বললেন, 'হ্যাঁ । যেন ভারী দুঃখের গান।'

—'দিব্যি তাজা গলা। গাইয়ের বয়স বেশি নয়।'

খুদে জনার্দন বললে, 'সুন্দরবনে সশস্ত্র সন্ন্যাসী, তার উপরে আবার নবীন গায়ক! দুনিয়াটা উলটেপালটে যাবে নাকি?'

রবিন বললেন, 'চলো, দু-পা এগিয়ে দেখা যাক, বাঘের সভায় গান শোনাতে এল কে? প্রভু, তুমিও এসো।'

বেশিদূর যেতে হল না। পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে পড়েছে, সেইখানে ঘাসজমির উপরে পা ছড়িয়ে বসে একটি ছোকরা জলের দিকে তাকিয়ে একমনেই গান গেয়ে চলেছে। ছোকরার বয়স, উনিশ-বিশের বেশি নয়। দরদভরা দুঃখের সুরে এমন তদগত হয়ে সে গান গাইছিল যে, রবিনদের পায়ের শব্দও শুনতে পেলে না।

রবিন তার কাঁধের উপরে একখানি হাত রেখে বললেন, 'কে তুমি?'

ছোকরা চমকে উঠে গান থামিয়ে ফেললে । তারপরে ফ্যালফ্যাল করে সকলকার মুখের দিকে তাকাতে লাগল ।

—'কে তুমি? তোমার নাম কী?'

—''আমার নাম, আনন্দ।'

—'নাম তোমার আনন্দ, কিন্তু গান গাইছ তুমি নিরানন্দের, আর তোমার দুই চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রুজল! আনন্দের এত নিরানন্দ কেন?'

আনন্দ নিরুত্তর হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

রবিন লক্ষ করে দেখলেন, ছোকরার চেহারা কেবল ভদ্র নয়, বেশ সুশ্রীও বটে। তার মুখ দেখে তাঁর মায়া হল। তিনি নরম-গলায় বললেন, 'আনন্দ, তোমার কী হয়েছে বলো! তুমি কোথায় থাকে?'

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে আনন্দ বললে, 'রঘুনাথপুরে।'

সচমকে রবীন বললেন, 'রঘুনাথপুরে? তুমি রাঘব রায়ের প্রজা?'

—'হ্যাঁ মশাই। ওই রাঘব রায়ই হয়েছে আমার যম!'

—'আনন্দ, তুমি সব কথা আমাদের কাছে খুলে বলো। কিছু লুকিয়ে না।'

—'আপনারা শুনে কী করবেন? কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

—'তবু সব আমি শুনতে চাই।'

আনন্দ অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'খুব সংক্ষেপেই সব শুনুন। আমি বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। আমরা ধনী না হলেও গরিব নই। নিমাইবাবু হচ্ছেন আমাদের প্রতিবেশী। তাঁর মেয়ে শ্রীমতীর সঙ্গে আমি ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলো করে আসছি। সবাই জানত, শ্রীমতীর সঙ্গে এই বছরেই আমার বিয়ে হবে। নিমাইবাবু নিজেও এতদিন ধরে শ্রীমতীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে সাধ্যসাধনা করে আসছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টের ফেরে হঠাৎ সব উলটে গেল! আজ শ্রীমতীর বিয়ে, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়। শ্রীমতী আর আমি দু-জনেই দু-জনকে ভালোবাসি।

তাকে হারাতে হবে বলেই মনের দুঃখে আমি নির্জনে এসে বসে আছি। আমি আর গাঁয়ে ফিরব না!'

রবিন বললেন, 'তোমাদের বিয়ে ভেঙে গেল কেন?'

—'শ্রীমতী খুব সুন্দরী। তাই তাকে বিয়ে করতে চায়, জমিদার রাঘব রায়।'

সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'রাঘব রায়! তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, আর তিন স্ত্রী বর্তমান!'

রবিন বেশি বিস্মিত হলেন সন্ন্যাসীর বিস্ময় দেখে। বললেন, 'তুমি রাঘব রায়কে চেন নাকি?'

সন্ন্যাসী সহজ ভাবেই বললেন, 'কিছু কিছু চিনি বটে! ... তারপর আনন্দ, এই বিয়েতে শ্রীমতীর বাবা মত দিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ । কিন্তু বোধহয় নিজের ইচ্ছায় দেননি। কারণ, রাঘব রায় ভয় দেখিয়েছে, টাকার লোভও দেখিয়েছে।'

রবিন নিজের মনে খানিকক্ষণ শিস দিলেন। তারপর হঠাৎ শিস থামিয়ে বললেন, 'আনন্দ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো । এ বিয়ে হবে না।'

শ্রীমতীর বিয়ে

স্বামী ভোজানন্দকে দলে পেয়ে রবিনের বড়ো সুবিধা হয়েছিল। কারণ সে কেবল পাঁচজনের খোরাক একলা সাবাড় করতে পারত না, এত ভালো রাঁধতেও পারত যে, রবিনের দলের লোকেরা যখন-তখন বলে— 'বনবাস হয়েছে আমাদের স্বর্গবাস!'

খুদে জনার্দন গোগ্রাসে মাংস গিলতে গিলতে বলে, 'উঁহু, স্বর্গেও এমন পাকা রাঁধিয়ে মিলবে না। ভোজানন্দ ভায়া নরকে গেলে আমিও স্বর্গে যেতে রাজি হব না!'

ভোজানন্দ খাপ্পা হয়ে বলে, 'খোকা-তালগাছের কথার ছিরি দ্যাখো! আমি যে নরকে যাব, এখবর তোমায় কে দিলে?'

খুদে জনার্দনও ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'দ্যাখো নরহস্তী! আমাকে খোকা-তালগাছ বলে কক্ষনো ডেকো না। ও-নামে ডাকলেই আমি রেগে পাগল হয়ে যাই!'

ভোজানন্দ চোখ পাকিয়ে বলে, 'তুমি খোকা-তালগাছ নও, কিন্তু আমি নরহস্তী? এ খোকামিও সইতে হবে নাকি?'

—'নরহস্তী বলব না তো অত মোটা মানুষকে কী বলে ডাকব শুনি?'

রেগে তিনটে হয়ে ভোজানন্দ বলে, 'কী! আমি মোটা? আমার এই হাতের গুলি দেখেছ? এর ওপরে পড়লে লোহার ডান্ডাও ভেঙে যায়! আমার গায়ে এক ছটাক চর্বি নেই—খালি মোটা মোটা হাড় আর পেশী। আমি ইচ্ছে করলে এখুনি এক টানে খোকা-তালগাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে ছুড়ে ওই নদীর জলে ফেলে দিতে পারি!'

খুদে জনার্দন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাল ঠুকে বলে, 'তাহলে সেই ইচ্ছাটা একবার প্রকাশ করে দেখা না ভায়া!'

ভোজানন্দও আস্তিন গুটোতে থাকে, তখন আর পাঁচজনে এসে পড়ে হাঁ হাঁ করে বলে, 'স্বামীজি, খুদে জনার্দনের ক্ষুদ্র কথায় কি কান দিতে আছে? ঝগড়াঝাঁটি করে চেঁচিয়ে তোমার গলা ভেঙে ফেলো না, তার চেয়ে একটা গান ধরো, আমরা সবাই শুনি!'

কেউ তার গান শুনতে চাইলেই ভোজনন্দের সব রাগ জল হয়ে যেত! কারণ, সে যাকে গান বলে মনে করত, তা শুনলে লোকের কান এবং প্রাণ পড়ত মূর্ছিত হয়। বেচারার বড়ো দুঃখ, সে গান ধরলেই তার কাছ থেকে শুধু মানুষ নয়, ভূচর খেচর উভচর—সর্বজাতীয় জীবই মানে মানে তফাতে সরে পড়ে। অথচ তার গান গাইবার ও শোনাবার শখ অত্যন্ত প্রবল! কেবল তার মাথা ঠান্ডা করবার জন্যেই রবীনের আড্ডা মাঝে মাঝে তার গান শোনবার জন্যে সাহস প্রকাশ করতে বাধ্য হত।

কিন্তু সে বাঁ কানে বাঁ হাত চেপে ও ডান হাত ভঙ্গিভরে নেড়ে নেড়ে গান ধরবার উপক্রম করলেই খুদে জনার্দন সভয়ে কাছে এসে মিনতির সুরে বলত, 'ভাই ভোজানন্দ! লক্ষ্মী দাদাটি আমার! আজ আর কষ্ট করে তুমি গান গেয়ো না! আমার সমস্ত অপরাধ মাপ করো—আমি আর কখনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না!'

আজ দুপুরে এইরকম একটা অভিনয়ের পর ভোজানন্দ গান গাইবার এবং জনার্দন মাপ চাইবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে রবিন এসে পড়ে বললেন, 'কী হে, এখনও তোমরা এখানে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছ? আজ বৈকালে শ্রীমতীর বিয়ে দেখবার জন্যে আমাদের রঘুনাথপুরে যেতে হবে, সে কথা কি মনে নেই? ওঠে, ওঠে, তোড়জোড় করো!'

সন্ন্যাসী এতক্ষণ দূরে বসে সকলের কথা শুনতে শুনতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, তিনি এখন উঠে এসে বললেন, 'তোমরা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে তো?'

রবিন হেসে বললেন, 'তুমিও যেতে চাও প্রভু? বেশ, চলো! কিন্তু দরকার হলে তরোয়াল চালাতে পারবে তো?'

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বললেন, 'যথাসময়েই সে পরিচয় পাবে!'

রঘুনাথপুরে আজ ভারী ধুমধাম! সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই জমিদারবাড়ি আলোর মালা পরে যেন পলাতক অন্ধকারকে উপহাস করতে লাগল! নহবতখানায় বাজছে মিষ্টি বাঁশি তালে তালে, তার তানে তানে জাগছে চারিদিকে উৎসবের আভাস! বাড়ির অঙ্গনে ছুটোছুটি করছে রঙিন কাপড় চাদরপরা দাসদাসী দ্বারবানের দল!

রঘুনাথপুরের পথে পথে আজ কেবল সাধারণ লোকদেরই ভিড় নেই—সেইসঙ্গে রয়েছে জমকালো পোশাকপর সেপাইশান্ত্রীরও জনতা! তার কারণ, দেশের রাজপ্রতিনিধি ও রাঘব রায়ের পৃষ্ঠপোষক কুমার রুদ্রনারায়ণও আজ এখানে এসেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বরযাত্রীরূপে। রাজপথের কোথাও মলিন কাপড় পরা গরিব, বা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে ভিখারির দেখা নেই। পাছে রুদ্রনারায়ণের সুখীচোখের বালি হয়, সেই ভয়ে রাঘব রায়ের হুকুমে বরকন্দাজরা নিম্নশ্রেণির সমস্ত লোককে নজরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ এখানে থাকবে শুধু আলো আর হাসি, নাচ আর গান, রং আর ছন্দ! পঞ্চাশ বছরের বর, তিন স্ত্রীর আঁচল ছেড়ে ষোলো বছরের বউকে বিয়ে করতে চলেছে, বড়োই আনন্দের কথা!

বরের শোভাযাত্রার সঙ্গে দেখা গেল মোহান্ত রামগিরি ও তাঁর গেরুয়াপরা শিষ্যদেরও। তারা বোধহয় এসেছেন বরবউকে আশীর্বাদ করতে!

রংচঙে পাোশাক পরলে, আতর মেখে ফুলের মালা গলায় ঝোলালে এবং চুলে, ভুরুতে, গোঁফে কলপ মাখলেই ছোকরা সাজা চলে, তাহলে রাঘব রায়কে দেখে আজ নবীন যুবক ছাড়া আর কিছু বললে অন্যায় হবে! আ মরি মরি, দুষ্ট বিধাতার চক্রান্তে বরের গালদুটি তুবড়ে গিয়েছে বটে,

কিন্তু মুখে কী মনমাতানো মৃদু হাসি! এমন দ্যাখনহাসি বর দেখবার সৌভাগ্য কজনের হয়? বরের সেই পোশাক, মালা, চুল ও হাসির বাহার দেখে রঘুনাথপুরের রাজপথের দুই পাশে যত বাড়ির যত জানলায় যত কুলবধু উঁকিঝুকি মারছিল, সবাই খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে না পড়ে পারেনি। রঘুনাথপুরের কুকুর বিড়াল, কাক চিলরাও সেদিন হেসেছিল কি না জানি না, কারণ, তাদের হাসি মানুষ চেনে না। কিন্তু আস্তাকুড়ের আনাচে কানাচে বসে ওঅঞ্চলের পাগলরা যে দুনিয়া কী মজার ঠাঁই ভেবে হেসে ফেলেছিল, সেখবর আমরা পেয়েছি!

পাত্র সভাস্থ হল। কনের বাপের মনের ভিতরে কী হচ্ছিল বাইরের কেউ তা জানলে না, কিন্তু তিনি মুখে খুব হাসছিলেন। হাসবেন না? হাসা তো উচিত! বরের বন্ধু দেশের রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং তাঁর অতিথি হয়েছেন, এটা কি কম ভাগ্যের কথা?

রুদ্রনারায়ণ ভারিক্কিচালে কনের ব্যাপকে ডেকে বললেন, ‘ওহে নিমাই, তোমার বরাত খুব ভালো! রঘুনাথপুরের জমিদারবাড়ি আর রাজবাড়ি একই কথা, তোমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়ল!’

নিমাইয়ের জবাব দেবার ভরসা হল না, অত্যন্ত আপ্যায়িতের মতো হেঁটমুখে মাথা চুলকোতে লাগল।

রাঘব রায় তখন মনে মনে বাসরঘরে গাইবার জন্যে গান নির্বাচন করছিল।

মোহান্ত রামগিরি বললে, ‘লগ্ন হয়েছে। এইবারে পাত্রকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও!’

অমনি সভার ভিতর থেকে নানা কণ্ঠে শোনা গেল—‘পাত্রকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও! পাত্রকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও!’

রুদ্রনারায়ণ সভার বিপুল জনতার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আমার সামনে এমন অসভ্যের মতো চ্যাঁচায় কারা? হঠাৎ সভার ভিড় এত বেড়ে উঠল কেন?'

রামগিরি লক্ষ করে বললে, 'দেখে মনে হচ্ছে, বহু রবাহূত, অনাহূতের দল সভার ভিতরে এসে ঢুকেছে!'

রুদ্রনারায়ণ গর্জন করে বললেন, 'ওদের দূর করে দাও!'

'পাত্রকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও-পাত্রকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও' বলতে বলতে এক ছোকরার হাত ধরে একটি ছিপছিপে লোক ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখেই রুদ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন! এ যে সেই তিরন্দাজ তিনকড়ি—না, না, রবিডাকাত! তার কাঁধে আজ ধনুক নেই দেখে তবু তিনি কতকটা আশ্বস্ত হলেন!

রামগিরির বুক গুর গুর করতে লাগল। রাঘব রায়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু!

রবিন আবার চিৎকার করে বললেন, 'মহান্ত মহারাজা হুকুম দিয়েছেন—পাত্রকে ছাঁদনাতলায়

নিয়ে যাও! যাও না হে আনন্দ, ছাঁদনাতলায় যাও না! এত লজ্জা কীসের বাপু?' বলেই তিনি ছোকরাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন।

রুদ্রনারায়ণ আবার গর্জন করে বললেন, 'এসবের মানে কী?'

রবিন হাত জোড় করে বললেন, 'হুজুর, আজ যে আনন্দের সঙ্গে শ্রীমতীর বিয়ে! পাত্রকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাও!'

রামগিরি চিৎকার করে বললেন, 'শ্রীমতীর সঙ্গে বিয়ে হবে জমিদার রাঘব রায়ের। কে তোমাকে এখানে আনন্দকে আনতে বললে?'

রবিন আবার রুদ্রনারায়ণের দিকে ফিরে জোড়হাতে বললেন, 'হুজুর, এ কীরকম অন্যায় কথা, বিচার করে দেখুন। একজন তিনবারের পর চারবার বিয়ে করার সুযোগ পাবে, আর একজন একবারও পাবে না?... আর, রাঘব রায় এখানে কেন? ওর ছাঁদনাতলা তো শ্মশান ঘাট! হুকুম দেন তো ওকে সেইখানেই নিয়ে যাই!'

সভার নানা দিক থেকে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক উচ্চৈঃস্বরে একসঙ্গে হেসে উঠল।

রাঘব রায় মুখ লাল করে ভয়ানক জোরে চিৎকার করলে, 'ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! রাবিডাকাতের ষড়যন্ত্র।'

রুদ্রনারায়ণ হাঁকলেন, 'পাইক! বরকন্দাজ! এখনই এই ডাকাতটাকে গ্রেপ্তার করো।'

সেপাই শান্ত্রীরা এক পা এগুবার আগেই দেখা গেল, নানা দিকের অন্তরাল থেকে দলে দলে অস্ত্রধারী লোক ছুটে এসে রবিনের চারিপাশ ঘিরে দাঁড়াচ্ছে!

রুদ্রনারায়ণ অসহায়ের মতো চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, সভার কোন দিকটা বেশি নিরাপদ!

নিমাই কাঁদো কাঁদো মুখে কাতর স্বরে বললে, 'রবিনবাবু! গরিবের ওপরে দয়া করুন! বিবাহসভায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন না!'

পিছন থেকে গম্ভীর স্বর জাগল, 'না, আমি যখন আছি, তখন এখানে কখনও রক্তগঙ্গা বইবে না!'

রবিন সবিস্ময়ে ফিরে দেখলেন, সেই তরবারিধারী সন্ন্যাসীর দীর্ঘ মূর্তি একেবারে সভার মাঝখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রুদ্রনারায়ণ হুমকি দিয়ে বললেন, 'তুমি আবার কে হে বাপু, এখানে এলে মুরুব্বি আনা করতে?'

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন, 'আমি? তুমিও আমাকে চিনতে পারছ না?' বলতে বলতে তিনি মাথার পাগড়ি আর পরচুলার গোঁফদাড়ি খুলে ফেললেন!

সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল চমৎকৃত হয়ে! তারপরেই চিৎকার জাগল...'জয় মহারাজা ইন্দ্রদমনের জয়! জয় মহারাজা ইন্দ্রদমনের জয়! জয় মহারাজা ইন্দ্রদমনের জয়!'

জয়ধ্বনি ও বিস্ময়-কোলাহল বন্ধ হলে পর ইন্দ্রদমন বললেন, 'রুদ্রনারায়ণ, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। তোমার অবিচারে, অত্যাচারে সারা দেশে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে, সুদূর তীর্থক্ষেত্রেও আমার কানে গিয়ে সে কথা পৌঁছেছিল। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু স্বচক্ষে সমস্ত দেখবার জন্যে আজ আমি ছদ্মবেশে দেশে ফিরে এসেছি, তোমার নামে একটা অভিযোগও মিথ্যা নয়।'

রুদ্রনারায়ণ ঘাড় হেঁট করে বললেন, 'মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন।'

—'ক্ষমা? ক্ষমার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর মোহান্ত রামগিরি, জমিদার রাঘব রায়! কুমার রুদ্রনারায়ণের অধঃপতনের প্রধান কারণই হচ্ছ তোমরা দু-জন।'

রামগিরি ক্ষীণ স্বরে বললে, 'মহারাজ—'

—'চুপ! তোদের কারুর কোনও কথাই আর শুনতে চাই না। রুদ্রনারায়ণ! রামগিরি! রাঘব রায়! তোমাদের তিনজনকেই নির্বাসনদণ্ড

দিলুম। কাল সকালে তোমরা যদি আমার রাজ্যের মধ্যে থাকো, তাহলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে! যাও, এখনই আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যাও!'

তিন মূর্তি একসঙ্গে সভার ভিতর থেকে সুড়সুড়ি করে বেরিয়ে গেল!

কনের বাপের দিকে ফিরে ইন্দ্রদমন বললেন, 'নিমাই, লগ্নের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়—আনন্দকে নিয়ে বিবাহের স্থানে যাও। আজ আমি নিজে উপস্থিত থেকে বরবধূকে আশীর্বাদ করব।'

আনন্দকে এখন মূর্তিমান আনন্দের মতোই দেখাচ্ছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার সমস্ত নিরানন্দ!

রবিন এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রদমনের সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, 'মহারাজ, চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। আমার উপরে কী আদেশ প্রভু?'

—'ভালো কাজই করো, আর মন্দ কাজই করো, তুমি হচ্ছ ডাকাত!'

—'স্বীকার করছি। শাস্তি দিন।'

—'তোমাকে এই শাস্তি দিলুম, তুমি আর কখনও ডাকাতি করতে পারবে না।'

—'মহারাজ! রাজ্যে যদি শাসনকর্তা থাকেন, রক্ষক যদি ভক্ষক না হন, তাহলে আমার ডাকাতি করবার প্রয়োজন কী?'

—'সাধু রবিন, সাধু! তোমার কথা আমি মনে রাখব।'

দূরে দাঁড়িয়ে স্বামী ভোজানন্দ চুপি চুপি বললে, 'সব ভালো যার শেষ ভালো! কী আনন্দ, কী আনন্দ! আমার একটা গান গাইবার সাধ হচ্ছে!'

শিউরে উঠে খুদে জনার্দন বললে, 'সর্বনাশ! চুপ, চুপ! তুমি এখানে গান গাইলেই তোমার শূলদণ্ড হবে!'